সুমন্ত আসলাম

এই তো তুমি এই তো

pathfinder

ANIK

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Edited By
Shamiul Islam Anik

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

এই তো তুমি এই তো

সুমন্ত আসলাম

Scanned By : Kamrul Ahsan

Edited By : Shamiul Islam Anik

Website : www.banglapdf.net

Facebook
www.facebook.com/Banglapdf.net

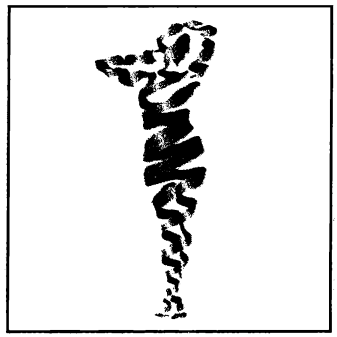

সাদিদ আড়চোখে মেয়েটার দিকে তাকাল। উদাস হয়ে তাকিয়ে আছে সে সামনের দিকে, যেখানে কিছু নেই, শূন্য। খুব ধীর পায়ে আরো একটু এগিয়ে গেল সে, 'জানেন, কিছুক্ষণ আগে একটা মেয়ে মারা গেছে গলায় ওড়না পেচিয়ে!'

সরল চাহনিতে মেয়েটা এক পলক সাদিদের দিকে তাকাল, কিন্তু বলল না কিছু সে। হঠাৎ, ছাদের এই নির্জনতায়, কারো গলার স্বর শুনে যেরকম চমকে ওঠার কথা, সেরকম চমকালও না মেয়েটা। সাদিদ জানে, মেয়েদের দুটো না, তিনটে চোখ। শরীরের সামনের দু চোখ দিয়ে তারা যা দেখে, তার চেয়ে বেশি দেখে তাদের ভেতরে যে চোখটা আছে, তা দিয়ে।

আরো দুটো ঘটনা বলার পর চেহারাটা হাসি হাসি করে ফেলল সাদিদ, 'মন খারাপ হয়ে গেল আপনার! আনন্দের ব্যাপার হচ্ছে-প্রবল ঝড়ের মাঝে সব ডাল-পালা-পাতা হারিয়েও যে গাছটা দাঁড়িয়ে থাকে, ওই গাছটা কদিন পর আবার যখন নতুন পাতা জাগায় নিজের বুকে, আস্তে আস্তে বাড়িয়ে নতুন বাহু, ওটাই আনন্দের। মানুষের জীবনটাও এরকম। এখানে কষ্ট আছে, অপমান আছে, ঘৃণা আছে, বর্বরতা আছে, প্রতারণা আছে, অনেক কিছু আছে। এসব ঘিরেই যে জীবন, সেটাই আনন্দের জীবন, আনন্দময় বেঁচে থাকা।'

'আমাকে দেখে আপনার এসব কথা মনে হচ্ছে কেন?'

সাদিদ মাথাটা নিচু করে আবার তুলে বলল, 'তার আগে আমরা কি আমাদের নামটা জানতে পারি?' সাদিদ উত্তর পাওয়ার আগেই বলল, 'আমি সাদিদ, সাদিদ নাজমুস।'

মেয়েটা আবার শূন্য দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি অর্না, অর্না তাবাসসুম।'

অর্নার হাতের ছোট্ট টবে রাখা গাছটার দিকে তাকায় সাদিদ, 'ভালোবাসা হচ্ছে টবে রাখা এরকম গাছের মতো-রোদে ভেজাতে হয়, মাঝে মাঝে পানিতেও। ছুঁয়েও দেখতে হয় কখনো কখনো। নিষ্ঠা নিয়ে এক পরম পরিচর্যা। তবেই সে প্রস্ফুটিত, সুবাসিত, আর বর্ণিল।'

চোখ মেলে এই প্রথম অর্না সাদিদের দিকে তাকাল। সাদিদ আলতো ভাবে ঘুরে দাঁড়াল, 'একটা প্রশ্ন করি-একজন মানুষের জীবনে কতবার ভালোবাসা আসতে পারে?' সাদিদ অর্নার চোখের দিকে তাকাল, নিজেই উত্তর দিল, 'অনেকবার, মৃত্যু কাছে না আসা পর্যন্ত। যাদের জীবনে ভালোবাসা থাকে না, তারা প্রাণহীন মানুষ, উপরে ফেলা গাছের মতো।'

এই তো তুমি এই তো

সুমন্ত আসলাম

স্বত্ব © লেখক

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১২

অন্বেষা ২৮৬

অন্বেষা

প্রকাশক
মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন
অন্বেষা প্রকাশন
৯ বাংলাবাজার ঢাকা
ফোন : ৭১২৪৯৮৫, ০১৯১১৩৯৪৯১৭

প্রচ্ছদ
সুহর্ষ সৌম্য

অক্ষর বিন্যাস
মোঃ নাছির উদ্দিন

মুদ্রণ
প্রগতি প্রিন্টার্স
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা

যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক
মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

মূল্য : ১৬০.০০ টাকা মাত্র

Ai to tomi ai to by Sumanto Aslam.
First Published February Book Fair 2012
Mohammed Shahadat Hossain
Annesha Prokashon, 9 Banglabazar, Dhaka.

www.anneshaprokashon.com
e-mail annesha_prokashon@yahoo.com

Price : Tk. 160.00 only **US $7.00**

ISBN 978 984 7116 61 7 Code 286

ছোট্ট ঘাসফুলটাও আমরা ছুঁয়ে দেখি একসঙ্গে, ঘর থেকে বের হলেও দুজন একসঙ্গেই — কোনো খাবারঘরে, ক্রেতা হয়ে কিংবা কোনো আত্মীয় আবাসে। কারণ-অকারণে হেসে উঠি মুহূর্তে মুহূর্তে, বোধ আর বোধহীনতা বোধগম্য না হলে কথা বলি একান্তে। দুঃখ না যতটা ভাবায় আমাদের, আনন্দ আর সুখ ভাবায় বেশি — এত আনন্দ কেন জীবনে, এত সুখ কেন তা যাপনে!

প্রিয় ঊর্মি, প্রিয় ফারজানা ঊর্মি

কিছু না পাওয়া মাঝে মাঝে ভাবায় বটে, কিন্তু পরমুহূর্তেই ভাবি — না, সব পেয়েছি আমি, স-ব। কেন ভাবি, কেন ভাবি বলো তো!

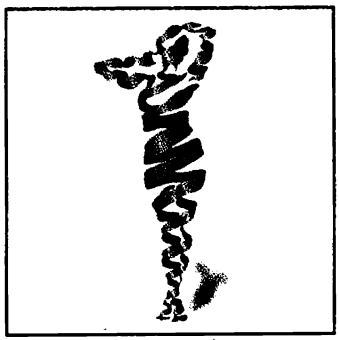

বারান্দায় এসেই খালিদ সুবহান সাহেব দেখলেন, একটা কলার খোসা পড়ে আছে মেঝেতে। কপালের দু'পাশটা সঙ্গে সঙ্গে দপদপ করে উঠল তার। দু হাতের দুটো আঙুল দিয়ে জায়গা দুটোতে চাপ দিয়ে কুঁচকে ফেললেন কপালটা। সেভাবেই দাঁড়িয়ে থেকে খোসাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি কিছুক্ষণ। তারপর একটু উপুড় হয়ে, খোসাটা হাতে নিয়ে, চোখ বরাবর এনে, হাসার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু হাসিটা ঠিক হাসি হয়ে উঠল না। কেমন যেন সেদ্ধ না হওয়া মাংস চিবানোর মতো মনে হলো চেহারাটা।

চিবিয়ে চিবিয়েই হাসতে থাকেন খালিদ সুবহান সাহেব, বেশ কিছুক্ষণ। তারপর খোসাটা হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগুতে থাকেন পাশের রুমের দিকে। নাতাশা মুমতাজ তার পুরনো কাঠের আলমারিটা গোছাচ্ছিলেন। স্বামীকে রুমে ঢুকতে দেখে একপলক তাকালেন, কিন্তু কিছু বললেন না। খালিদ সাহেব আরো একটু এগিয়ে গিয়ে চেহারাটা মাপার চেষ্টা করলেন তার। গম্ভীর হয়ে আছেন স্ত্রী—সেটা রাগ, না কাজের ব্যস্ততা, বুঝতে পারলেন না। হাতের দু আঙুল দিয়ে চেপে ধরা কলার খোসাটা আবার তিনি চোখ বরাবর আনলেন, হাসার চেষ্টা করলেন। কিন্ত সেটা আগের মতোই হলো—ঠিক হাসি হলো না, সেদ্ধ না হওয়া মাংস চাবানোর মতো হলো!

কলার খোসাসহ হাতটা শরীরের পেছনে আনলেন তিনি। তারপর আবার স্ত্রীর চেহারার দিকে তাকালেন। না, বোঝা যাচ্ছে না তাকে এখনও। চেহারা আগের মতোই। তবু তিনি আরো এক পা এগিয়ে গেলেন স্ত্রীর দিকে। অবস্থা বুঝে কিছুটা শংকিত গলায় বললেন, 'নাতাশা মুমতাজ, আমি কি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?'

চেহারাটা এতক্ষণ যাওবা কিছুটা স্বাভাবিক ছিল, স্বামীর কথা শুনে চোখ দুটো কুঁচকে ফেললেন নাতাশা মুমতাজ। বেশ রাগী রাগী হয়ে গেল তার চেহারাটা, কিন্তু কিছু বললেন না তিনি। আগের মতোই কাজ করতে লাগলেন, বরং আগের চেয়ে একটু বেশিই মনোযোগীই মনে হলো কাপড় গোছানোর ব্যাপারে।

দু ঠোঁট আরো একটু প্রশস্ত করলেন খালিদ সুবহান সাহেব। গলার স্বরটা আরো একটু মোলায়েম করে বললেন, 'তোমার কানের সমস্যাটা সম্ভবত এখনো যায়নি!'

ঝট করে স্বামীর দিকে ফিরলেন নাতাশা মুমতাজ। আগের চেয়ে রাগী চোখে তাকালেন তার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট দুটো আরো একটু প্রশস্ত করার চেষ্টা করেন খালিদ সুবহান সাহেব, 'আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছ কেন? আমি কি ঋণখেলাপি, না তোমার শত্রু?' হাসির মাত্রাটা আরো একটু বাড়ানোর চেষ্টা করে তিনি বললেন, 'বুঝতে পেরেছি তোমার কানের সমস্যাটা চলে গেছে। প্রথম কথা বলার পর যখন কিছু বলছিলে না, তখন ভীষন রাগ হচ্ছিল। না না তোমার ওপর না, ওই ডাক্তারের ওপর। আজকাল অধিকাংশ ডাক্তারই তো নিজে ইচ্ছায় ওষুধ লেখে না প্রেশক্রিপশনে। কোন ওষুধ কোম্পানি কত বড় ফ্রিজ দিল, কত বেশি টনের এসি দিল, সেটার ওপর নির্ভর করে ওষুধ লেখা।' খালিদ সুবহান সাহেব স্ত্রীর দিকে আরো একপলক তাকালেন। স্ত্রীর মেজাজের তীব্রতা এখনো বুঝতে পারছেন না তিনি। তবুও কিছুটা মোসাহেবী গলায় বললেন, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম যে তোমাকে!'

নাতাশা মুমতাজ এবারও কোনো কথা বললেন না। আলমারি গোছাতে লাগলেন আগের মতো। খালিদ সুবহান সাহেব স্ত্রীর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কিছুটা রাগী গলায় বললেন, 'আহ্—!' সঙ্গে সঙ্গে নিজের মাঝে সংশোধনী এনে, রাগের জায়গায় প্রফুল্লতা জাগিয়ে, মুখটা হাসি হাসি করে বললেন, 'কথা বলছ না কেন তুমি, নাতাশা?

প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে নাতাশা মুমতাজ বললেন, 'কানের কাছে এতো ভ্যাজর ভ্যাজর করছেন কেন আপনি?'

কলার খোসাটা পেছন থেকে সামনে আনলেন খালিদ সুবহান সাহেব, 'এটা কি নাতাশা বেগম?'

ভালো করে এবার স্বামীর দিকে তাকালেন তিনি। চোখ কিছুটা বড় করে বললেন, 'কেন, আপনি চেনেন না?'

'আপাতত চিনছি না।'

'ওটা একটা কলার খোসা, ছাগলে খায়।' নাতাশা মুমতাজ সন্দেহজনক গলায় বললেন, 'তা আপনার হাতে কেন ওটা! খাবেন নাকি?'

'খেতে পারলে তো ভালোই হতো!' খালিদ সুবহান সাহেব আড়চোখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন, 'মাঝে মাঝে বাসায় যে ধরনের রান্না খাই, তার চেয়ে এই কলার খোসা অতি উত্তম, সুস্বাদুও বটে।'

'আমি তো বলেছি আমার হাতের রান্না ভালো না লাগলে আপনি আরেকজনকে নিয়ে আসতে পারেন।' নাতাশা মুমতাজ আবার আলমারি গোছাতে শুরু করলেন, 'যান, আমি আপনাকে অনুমতি দিলাম।'

'সেই তো অনুমতি দিলে তুমি, কিন্তু বয়স তো এখন আর অনুমতি দেবে না। যাক গে— ।' খালিদ সাহেব কলার খোসাটা স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই যে জলজ্যান্ত কলার খোসাটা দেখছ, এটা পড়ে থাকার কথা কোনো ময়লা ফেলার বাক্সে কিংবা ড্রাস্টবিনে, কিন্তু এটা পড়ে ছিল বারান্দায়, বারান্দার মেঝেতে!' খালিদ সাহেব স্ত্রীর দিকে ঝুঁকে দাঁড়ালেন, 'এবার আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে—এটা বারান্দায় ফেলল কে?'

'এটা বারান্দায় কে ফেলল, সেটার আমি কি জানি!'

'তুমি জানো না?'

'না।'

'তুমি তো সংসারের সব জানো, এটা জানো না কেন?'

'কী মুশকিল! কে না কে বারান্দায় কলার খোসা ফেলেছে, এটা আমি জানব কী করে!

'ধরে নিলাম জানো না। কিন্তু এটা তো জানো—এটার ওপর কারো পা পড়লে তার কী হতো?

'না, এটাও জানি না।'

'তা জানবে কেন! তোমরা মেয়েরা তো শুধু জানো—পটলের সঙ্গে দই মেখে মাংস রান্না, বেগুন আর দুধ দিয়ে পায়েস রান্না, জাম্বুরা আর টাকি মাছের কোপ্তা—যত সব অখাদ্য। মুখে দিলেই বমি আসে, ওয়া...।' খালিদ সাহেব বমি করার মতো ভঙ্গি করে বলেন, 'আজকাল টিভি খুললেই

খালি রান্নার অনুষ্ঠান। এটা দিয়ে ওটা রাঁধো, সেটা দিয়ে এটা রাঁধো। যতসব আজেবাজে রান্না! মনে হয় দেশে আর কোনো কাজ নাই। রান্না করো, আর খেয়ে খেয়ে পেট খারাপ করো। তোমার ছেলেটাও হয়েছে তোমার মতো। মুড়ির মতো টাকা খরচ করে ওকে ডাক্তারি পড়াচ্ছি, আর সে কিনা আছে রান্না নিয়ে। নতুন নতুন খাবার তৈরি করবে সে। টেলিভিশনে অনুষ্ঠান করবে—সঞ্জীব কাপুর হবে, টমি মিয়া হবে, কাইলি কং হবে! যত্তোসব!'

'আস্তে বলেন তো আপনি! আপনার ছেলে-মেয়ে কিন্তু আপনার এই বকবক করার স্বভাবে ভার্সিটি ছেড়ে বাসায়ই আসতে চায় না। ছুটি-ছাটাতেও হোস্টেলে কাটায়। অনেকদিন পর ছুটিতে এবার একটু বাড়িতে এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে বকবকানি শুরু হয়ে গেছে আপনার! আশপাশেই আছে কিন্তু ওরা! আস্তে কথা বলেন, সবচেয়ে ভালো হয় কথা না বলা।'

'কথা বলব না কেন? বললেনও আস্তে বলব কেন! আমি কি তোমাকে ঘুষ সাধছি, না লজ্জামাখা গলায় ভলোবাসার কথা বলছি!'

'আপনি এখান থেকে যাবেন?' প্রচণ্ড রূঢ় গলায় বললেন নাতাশা মুমতাজ।

'যাচ্ছি যাচ্ছি।' চলে যেতে নিয়েই থেমে যান খালিদ সুবহান। ঘুরে দাঁড়িয়ে নাতাশা মুমতাজের দিকে তাকান, 'এই যে কলার খোসাটা বারান্দায় পড়ে ছিল, তুমি বলো—এটা কি কারো চোখে পড়ত? না, পড়ত না। কেউ হাঁটতে হাঁটতে এর ওপর পা রেখে পড়ে যেত, তারপর তাকে নিয়ে শুরু হতো দৌড়াদৌড়ি। হাসপাতালে যাও, এটা পরীক্ষা করো, ওটা পরীক্ষা করো, শত রকমের ঝামেলা। কেউ আজকাল দেখে-শুনে চলাফেরা করে না। বড় আফসোস, আজকাল কেউ তেমন সচেতন হতে শিখল না।'

'কই সচেতন হওয়া শিখল না?'

'কই সচেতন হওয়া শিখল!' খালিদ সুবহান সাহেব চেহারা বিকৃত করে বললেন, 'তোমরা ঘর ঝাড়ু দেওয়ার পরও ময়লা থাকে মেঝেতে; খাবার টেবিলে গ্লাস সাজিয়ে রাখো এলোমেলাভাবে; বাথরুমে সাবানের কেসে পানি জমা হয়ে থাকে; পানির ট্যাপ ঠিকমতো বন্ধ করো না, টপটপ শব্দ হয় সব সময়; পায়ের স্যান্ডেল খুলে যেখানে ইচ্ছে সেখানে ছড়িয়ে রাখো; ভেজা কাপড় ঠিকমতো মেলে দাও না, ভাঁজ হয়ে থাকে; টিভির রিমোট যথাস্থানে না থেকে গড়াগড়ি করে ড্রইংরুমে, আরো কত কী!'

'সংসারে এসব হয়েই তাকে।'

'কিন্তু কই, তুমি তো বাম পায়ের স্যান্ডেল তো ডান পায়ে পরো না; গায়ের জামা তো শাড়ির ওপরে পরো না, শাড়ির নিচেই পরো; কানের দুল নাকে থাকে না; চোখের চশমা থাকে না থুতনিতে; কপালে যে টিপ দাও মাঝে মাঝে, সেটা মাথার চান্দিতে দাও না!' খালিদ সুবহান সাহেব একটু থেমে বলেন, 'মানুষ নিজের বেলা সব টনটনে রাখে, সকলের হলেই সেটা আর টনটনে থাকে না। যেমন খুশি তেমন হয়ে যায়।'

'চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর থেকেই আপনি যেন কেমন হয়ে গেছেন। আগে তো এমন ছিলেন না!'

'আগেও আমি এরকম ছিলাম। বেশির ভাগ সময় অফিসে থাকতে হতো বলে কিছু বলার সময় পেতাম না।'

'আপনি দয়া করে একটু চুপ করবেন। আপনার ছেলে-মেয়ের কথা না হয় বাদই দিলাম— ।' নাতাশা মুমতাজ দরজার একপলক তাকিয়ে বললেন, 'আরো একটা যে মেয়ে এসেছে আপনার বাসায়, সেটা খেয়াল আছে?'

'খেয়াল থাকবে না কেন, অর্না তো আমার মেয়েই।'

'ও কিন্তু এরকম পরিবেশে থাকতে অভ্যস্ত না। আপনার ছোট ভাই কিন্তু আপনার চেয়ে অর্থশালী, আপনার চেয়ে অনেক বড় এবং সুন্দর বাসা ওর। তার মেয়ে ওরকম বড় আর সুন্দর বাসা ছেড়ে মফস্বলের মতো এই এখানে এসেছে, থাকতে এসেছে কয়দিনের জন্য, সেটা কেন, তা কিন্তু আপনি জানেন!' নাতাশা মুমতাজ চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। আঁচল দিয়ে মুখটা ঢেকে বললেন, 'মেয়েটার দিকে তাকাতে পারি না আমি, বুকটা ফেটে আসে আমার। চাঁদের মতো মেয়েটা এখানে আসার পর থেকেই হাসতে ভুলে গেছি আমি। সারাক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে ও, কথা প্রায় বলেই না! এত শান্ত-শিষ্ট একটা মেয়ের এরকম হবে কেন!'

খালিদ সুবহান সাহেব টের পেলেন, মাথার দু পাশটা আবার চেপে আসছে তার, মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে, রাগ এসে ভর করছে শরীরে। সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেললেন তিনি, হাসিটা মুখে ধরে রাখার চেষ্টা করলেন, রাখলেনও অনেকক্ষণ। তারপর স্ত্রীর হাতে কলার খোসাটা দিয়ে চলে এলেন বেডরুমে।

বিছানার পাশে রাখা টেলিফোনের রিসিভারটা হাতে নিলেন খালিদ সুবহান সাহেব। নাম্বার টিপে রিসিভারটা কানের কাছে ধরে বললেন, 'ডাক্তার, আমি একটা হিসাব করেছি আজ।'

ডাক্তার শাহরিয়ার আবদুল্লাহ মুচকি হেসে বললেন, 'কীসের হিসাব করেছেন, সুবহান সাহেব?'

পাশের টেবিল থেকে একটা রুল-টানা খাতা সামনে মেলে ধরে খালিদ সুবহান সাহেব বললেন, 'আজ আমি কতবার রাগ করেছি আর কতবার হেসেছি তার একটা হিসাব লিখে রেখেছি, ডাক্তার।'

খুব উৎফুল্ল হয়ে ডাক্তার শাহরিয়ার আবদুল্লাহ বললেন, 'চমৎকার কাজ করেছেন আপনি।'

'তুমি শুনবে না আমি কতবার রাগ করেছি আর কতবার হেসেছি?'

'অবশ্যই অবশ্যই।'

রুল-টানা খাতাটির দিকে ভালো করে তাকান খালিদ সুবহান। তারপর মনে মনে হিসাব করে বলেন, 'রেগেছি ৯ বার, হেসেছি ১৭ বার।'

'কংগ্রাটস! আপনার তো অনেক ইমপ্রুভ হয়েছে।'

'থ্যাংক ইউ, ডাক্তার। তোমার পরামর্শ মতোই আমি হাসি-খুশি থাকার চেষ্টা করছি, কারণে-অকারণে হেসে যাচ্ছি। কিন্তু জানো, এই হাসার জন্যই ছোটবেলায় স্কুলে একবার পেটান খেয়েছিলাম স্যারের হাতে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আমাদের মৌলভী স্যার ছিলেন বড্ড খাটো মানুষ। ধর্ম সাবজেক্ট পড়াতেন তিনি আমাদের। স্কুলে আসতেন পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে। তখন তো খাটো খাটো পাঞ্জাবি পরা হতো। ক্লাসে এসে পড়াচ্ছেন স্যার। হঠাৎ দেখি, স্যারের পাঞ্জাবির নিচ দিয়ে পায়জামার লম্বা ফিতাটা ঝুলে আছে। স্যার হেঁটে হেঁটে আমাদের পড়াচ্ছেন, আর পায়জামার ফিতাটা ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো এদিক-ওদিক নড়ছে। সবাই ফিসফাস শুরু করে দিয়েছে, কিন্তু ফিক করে আমি হেসে উঠি হঠাৎ। শব্দটা বেশ জোরেই হয়। স্যার শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়ান। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হাসলি কেন? আচ্ছা ডাক্তার তুমি বলো, স্যারকে কি বলা যায়, স্যার আপনার পায়জামার ফিতাটা খুলে গেছে, আরো একটু খুলে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে! বলো, বলা যায়?'

'না, সেটা বলা যায় না।'

'আমিও বলতে পারিনি। আর বলতে পারিনি বলে স্যার আমার ডান হাতের তালুতে গুনে গুনে ছয়টা বেত মেরেছিলেন। বাসায় আসার পর আরেক যন্ত্রণা হচ্ছিল। সবাই জিজ্ঞেস করছিল, স্যার কেন মেরেছে।

স্যারকে যে কথা বলতে পারিনি, সেই কথা কি আর কাউকে বলা যায়! হাজার হলেও স্যার না, স্যারের একটা সম্মান আছে না!' খালিদ সুবহান সাহেব একটু থেমে বললেন, 'কিন্তু ডাক্তার, একটা কারণে মনটা খারাপ হয়ে আছে বেশ।'

কিছুটা উদগ্রীব ডাক্তার শাহরিয়ার বললেন, 'কেন?'

'অনেক ভেবে-চিন্তে দেখলাম—প্রত্যেক মানুষের উচিত প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু ভালো কাজ করা। আর সে মানুষটা দিনে কয়টা ভালো কাজ করল আর কয়টা খারাপ কাজ করল, তা একটা নোটবুকে লিখে রাখা। সারাদিন পর সেই মানুষটা যখন দেখবে সারাদিন সে ভালো কাজের চেয়ে খারাপ কাজ বেশি করেছে, তাতে তার মধ্যে একটা অপরাধবোধ জেগে উঠবে, তার মধ্যে একটা ইয়ে, মানে...মানে...দুঃখ দুঃখ ভাব আসবে, পরের দিন সে খারাপ কাজ-কর্ম কম করবে, ভালো কাজ বেশি করবে।'

'খুবই ভালো চিন্তা। আপনারর হার্টের জন্য এটা ভালো কাজ দেবে। এরকম ভালো ভালো চিন্তা করতে পারলে আপনার হার্টের অনেক সমস্যা দূর হয়ে যাবে। সুস্থ হয়ে উঠবেন আপনি।'

'মানুষের ভেতর কেমন যেন সচেতনতাও কমে গেছে। দিনকে দিন মানুষ অসচেতন হয়ে যাচ্ছে।'

'ঠিক বলেছেন আপনি।'

'কিন্তু ডাক্তার, দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে আজ, আমি চিন্তা করে দেখলাম আজ আমি কোনো ভালো কাজ করিনি।' বাসার কলিংবেলটা বেজে ওঠে হঠাৎ। খালিদ সুবহান সাহেব দরজার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কলিংবেল বাজছে। সম্ভবত কোনো ফকির এসেছে। আজ আমি ফকিরটাকে মাংস দিয়ে ভাত খাওয়াব, পেট ভরে খাওয়াব। কচি গরুর গোস্ত কিনে নিয়ে এসেছি আজ, খেতে খেতে ফকিরটা যতক্ষণ না ঢেঁকুর তুলবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে আমি খাওয়াতেই থাকব। এটা একটা ভালো কাজ হবে না?'

'অবশ্যই।'

'ডাক্তার, তার আগে তোমাকে একটা দরকারি জিনিস শিখাই। যেখানেই যাও, যেভাবেই থাকো, সচেতনভাবে থাকবে। সচেতনভাবে চলাফেরা করা খুব দরকার। সচেতনার অভাবেই বড় বড় দুর্ঘটনা ঘটে কিন্তু আজকাল।'

'খুব খাঁটি কথা বলেছেন আপনি।'

'তাই!' হো হো করে হেসে ওঠেন খালিদ সুবহান। ডাক্তার তাকে এভাবেই হাসতে বলেছেন, বুকের বাতাস বের করে হাসতে বলেছেন। হার্টে ফ্রেশ বাতাস ঢোকাতে হবে কিছুক্ষণ পরপর। তবেই হার্ট সুস্থ, আর হার্ট সুস্থ মানেই সুখী জীবন।

খালিদ সুবহান সাহেব রান্নাঘরের পাশ দিয়ে হেঁটে আসতে ছিলেন। কলিংবেল বাজছে, ওপাশ দিয়ে গিয়ে বাড়ির বাইরের দরজাটা খুলে দেবেন তিনি। দ্রুত তাই সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটা কলার খোসায় পা লেগে কিছুটা চিৎ হয়ে পড়ে যান তিনি, বারান্দার মেঝেতে। বেশ শব্দ হয় এতে। নাতাশা মুমতাজ দ্রুত এসে স্বামীকে তুলে ধরতেই খালিদ সুবহান সাহেব দেখেন, স্ত্রীকে দিয়ে আসা কলার খোসাটা এখনো তার হাতেই রয়েছে, বারান্দার মেঝেতেও রয়েছে আরেকটা কলার খোসা।

দুটো খোসার দিকে তাকিয়ে চেহারা বিকৃত করেই হেসে ফেলেন খালিদ সাহেব। নাতাশা মুমতাজ চোখ দুটো সরু করে বিশেষ ভঙ্গিমায় স্বামীর দিকে তাকালেন। তারপর কিছুক্ষণ আগে ডাক্তারকে যে উপদেশটা দিয়েছিলন খালিদ সাহেব, তারই পুনারাবৃত্তি করলেন বিদ্রূপ স্বরে, 'ডাক্তার, তার আগে তোমাকে একটা দরকারি জিনিস শিখাই। যেখানেই যাও, যেভাবেই থাকো, সচেতনভাবে থাকবে। সচেতনভাবে চলাফেরা করা খুব দরকার। সচেতনার অভাবেই বড় বড় দুর্ঘটনা ঘটে কিন্তু আজকাল।'

স্ত্রীর বিদ্রূপ মাখানো কথায় এখন সত্যি সত্যি কলার খোসাটা খেতে ইচ্ছে করছে তার। কিন্তু খালিদ সুবহান সাহেব হাসছেন. শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে হাসছেন, কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে হাসছেন!

পিঠে বেশ ব্যথা পেয়েছেন খালিদ সুবহান সাহেব। তবুও তিনি ঝট করে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তার আগে বারান্দার মেঝেতে পড়ে থাকা দ্বিতীয় কলার খোসাটা তুলে নিয়ে স্ত্রীর হাতে দিলেন। হাতে একটা কলার খোসা ছিলই, স্বামীর কাছ থেকে আরেকটা পেয়ে কিছুটা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এসব আমার হাতে দিচ্ছেন কেন আপনি?'

খালিদ সুবহান সাহেব বিগলিত একটা হাসি দিয়ে বললেন, 'ঘরে ছাগল নেই তো!'

নাশাতা মুমতাজ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন স্বামীর দিকে। কিন্তু ব্যাপারটা পাত্তা না দিয়ে তিনি চলে এলেন ড্রইংরুমের দরজার কাছে। কলিংবেল বাজছেই। দ্রুত দরজাটা খুলেই চমকে উঠলেন তিনি—চারটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে, চারজনের মুখেই মুখোশ। ছোট্ট করে একটা চিৎকার দিতেই মুখোশ পরা একজন বলল, 'আংকেল, ভয় পাবেন না, আমরা মানুষ।'

ভয় ভয় চেহারা নিয়েই হেসে ফেললেন খালিদ সুবহান সাহেব। কিন্তু ভেতরটা রাগে জ্বলে যাচ্ছে তার। হাসিটা ঠিক ধরে রাখা যাচ্ছে না চেহারায়। তার আগেই তিনি বললেন, 'মানুষ, সেটা তো বুঝতেই পারছি, কিন্তু মুখোশ পরে আছেন কেন আপনারা?'

'সেটা বলার আগে আমরা কি একটু বসতে পারি?' মুখোশ পরা আরেকজন বলল।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন খালিদ সুবহান সাহেব। ছেলেগুলো ঘরে ঢুকেই একটা সোফায় বসল। তৃতীয় জন একটু কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'একটু পানি খাওয়া যাবে?'

'পানি খাবেন!' খালিদ সাহেব কিছুটা ইতস্তত ভঙ্গিতে বললেন, 'তার আগে আমি কি আপনাদের চেহারাটা একবার দেখতে পারি? আমরা মানে, আমরা মানুষরা এমনি তো সারাক্ষণ একটা অদৃশ্য মুখোশ পরে থাকি। সেখানে এরকম একটা মুখোশ দেখতে খুব বেশি ভালো লাগছে না আমার।'

'ব্যাপারটা আমাদেরও ভালো লাগেনি। ওকে, খুলে ফেলছি।' সোফায় বসা প্রথম ছেলেটা তার মুখোশ খুলে ফেলে বলল, 'আমার নাম যুবেল, আমার কাছে জীবনটা হচ্ছে নদী, যে কেবল বয়েই যায়।'

দ্বিতীয় ছেলেটা মুখোশ খুলে বলল, 'আমি হচ্ছি সামী, অনেকেই আমাকে দেখে হুজুর মনে করে। তারা তখন নাম ধরে না ডেকে হুজুর হুজুর করে ডাকে আমাকে।' কথা শেষে নিজের ছাগলে দাড়িতে হাত বুলাল সামী।

'আমার নাম প্রদীপ্ত খান।' তৃতীয় ছেলেটা মুখোশ খুলতে খুলতে বলল, 'আমার প্রিয় বন্ধু হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

'উনি তো বেঁচে নেই।' খালিদ সুবহান সাহেব অবাক হয়ে বললেন।

'জি, উনি বেঁচে নেই।'

'বেঁচে না থাকলে বন্ধু হয় কীভাবে?'

'আপনার বাবা তো বোধহয় বেঁচে নেই।' প্রদীপ্ত জিজ্ঞেস করল।

'না, বেঁচে নেই।

'বাবা বেঁচে নেই, তবুও কি তিনি বাবা নন? অথবা আমাদের অনেকের জন্মের আগেই বাবা মারা যান, তাকে কি আমরা বাবা বলে মেনে নেই না?'

'তা নেই।'

'রবীন্দ্রনাথ বেঁচে নেই, আমাদের জন্মের আগে তিনি মারা গেছেন, তবু তিনি তাই আমার বন্ধু।' প্রদীপ্ত খুব আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল।

চতুর্থ জন সোফায় একটু সোজা হয়ে বসল। তারপর মুখোশটা খুলে ফেলে সোফার কোনায় রেখে দিয়ে বলল, 'মনন বললে সবাই আমাকেই চেনে। এই যে তিনজনকে দেখছেন, ওরা আমার বন্ধু, খুবই প্রিয় বন্ধু। ওদেরকে আমিই দেখে-শুনে রাখি, এমন কি মাঝে মাঝে থাকা-খাওয়ার টাকা-পয়সাও দিয়ে থাকি নিজের পকেট থেকে।'

যুবেল, সামী আর প্রদীপ্ত ঝট করে মননের দিকে তাকাল। আড়চোখে সেটা দেখে মুচকি একটা হাসি দিয়ে মনন বলল, 'খুব ভালো ছেলে ওরা,

আমি যা বলি তাই শোনে। যদিও বয়স আমাদের একই, তবুও গুরুজন বলতে ওরা আমাকেই বোঝে।'

'তা আপনি ওদের থাকা-খাওয়ার টাকা-পয়সা দেন, কিন্তু আপনার থাকা-খাওয়ার টাকা-পয়সা দেন কে?' খালিদ সুবহান মননের দিকে একটু ঝুঁকে বসে বললেন।

মনন ছোট্ট করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'এ কথাটা বলার আগে আমি কি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?'

'প্লিজ, বলো।'

'আমরা কি আপনাকে আংকেল বলে ডাকতে পারি?'

'সেটা আপনাদের ইচ্ছা।' খালিদ সুবহান সাহেব একটু ইতস্তত ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনারা অবশ্য আমাকে ভাই বলেও ডাকতে পারেন।'

'না না, ভাই বলে ডাকাটা ঠিক হবে না।' সামী ওর ছাগলে দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বলল।

খালিদ সাহেব কিছুটা চমকে উঠে বললেন, 'কেন?'

'আপনি মুরব্বী মানুষ, আপনাকে আমাদের আংকেল বলে ডাকাই উচিত। তা ছাড়া আপনার নিশ্চয়ই আমাদের বয়সী ছেলে আছে।' যুবেল খুব আগ্রহ নিয়ে বলল।

'আবার মেয়েও থাকতে পারে।' সামী আবার ওর ছাগলে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, 'তাই আমরা যদি আপনাকে ভাই বলে ডাকি, তাহলে ওরা আমাদের আংকেল বলে ডাকবে। ব্যাপারটা কি ঠিক হবে?'

'ঠিক হবে না কেন?' খালিদ সুবহান সাহেব ভ্রু কুঁচকে বলেন।

'মানে..., এমনি বললাম আর কি।' যুবেল পাশের তিনজনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই তোরা কি বলিস?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এমনি বলেছি আমরা।' মুখটা হাসি হাসি করে সামী, প্রদীপ্ত আর মনন প্রায় একসঙ্গে বলল।

'আচ্ছা আপনাকে যেন কী জিজ্ঞেস করেছিলাম?' খালিদ সুবহান সাহেব মননের দিকে তাকান।

'আংকেল, আপনি আমাদের আপনি আপনি করে বলছেন কেন?' মনন জিজ্ঞেস করল।

'এটা মোটেই শোভনীয় হচ্ছে না।' মাথা এদিক-ওদিক প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে প্রদীপ্ত বলল।

খালিদ সুবহান সাহেব ভ্রু কুঁচকে বললেন, 'কী হচ্ছে না?'

যুবেল কান পর্যন্ত হেসে বলল, 'শোভনীয় হচ্ছে না। আমরা তো আপনার ছেলের বয়সী।'

সামী সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল, 'কিংবা আপনার মেয়ের বয়সী।'

'আপনি আমাদের তুমি করে বলবেন।' মনন বলল।

'হু, তা কি যেন জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমি তোমাকে?' খালিদ সুবহান সাহেব আবার মননের দিকে আবার তাকান।

'আমি ওদের থাকা-খাওয়ার টাকা-পয়সা দেই, কিন্তু আমার থাকা খাওয়ার টাকা-পয়সা দেয় কে?' মনন বলল।

'কে দেয়?'

মনন কাঁধ দুটো উঁচু করে বেশ গর্বিত ভঙ্গিতে বলল, 'আমার বাবা দেন।'

'তোমার বাবার কারবার কি?'

'আমার বাবা স্টেট্স মানে এ্যামেরিকায় থাকেন।'

খালিদ সুবহান সাহেব মননের দিকে ভালো করে তাকালেন। তার চোখে কিছুটা বিশ্বাস, কিছুটা অবিশ্বাস। বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি সোজা হয়ে বসে বললেন, 'তা এবার বলো তো দেখি, তোমরা আমার কাছে কেন এসেছো?'

'আপনার বাসার যে ফ্ল্যাটটা খালি আছে আমরা সেটা ভাড়া নিতে চাচ্ছি।'

'ফ্ল্যাট ভাড়া নেবে?' খালিদ সুবহান সাহেব একটু ভেবে বললেন, 'ভালো কথা! কিন্তু এ রকম মুখোশ- টুখোশ পরে সং সেজে আসার কারণ কি?'

'কারণ অবশ্যই আছে, আংকেল।' যুবেল গলাটা বেশ ভারী করে বলল।

'সে এক মহা কারণ।' যুবেলের মতোই গলা ভারী করে বলল প্রদীপ্ত।

'কারণটা শোনা যাবে?' বেশ আগ্রহী হয়ে বললেন খালিদ সুবহান সাহেব।

'আমাদের মতো ব্যাচেলরদের দেখলেই বাড়িওয়ালারা মুখ কুঁচকে তাকায়, বাড়ি ভাড়া তো দূরের কথা ভালো মতো কথাই বলতে চায় না তারা।' যুবেল মনটা ভারী করে বলল, 'ব্যাপারটা বেশ অপমানজনক।'

'অথচ রবি আংকেল আমাদের মতো এই ব্যাচেলরদের দেখেই একটা কবিতা লিখেছিলেন—ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা...।'

প্রদীপ্তকে থামিয়ে দিয়ে খালিদ সুবহান সাহেব বললেন, 'রবি আংকেলটা আবার কে?'

'ওই যে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যার গান শুনলে খালি ঘুম আসে, খালি ঘুম আসে...।' প্রদীপ্ত উত্তর দেওয়ার আগে সামী বলল।

'আংকেল, ব্যাচেলর দেখলেই সবাই কি মনে করে জানেন, ব্যাচেলররা খারাপ।' খালিদ সুবহান সাহেবের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল যুবেল।

'আংকেল, আপনিই বলেন ব্যাচেলররা কি খারাপ? আপনিও তো একদিন ব্যাচেলর ছিলেন, আপনি কি খারাপ ছিলেন?' সামীও খালিদ সাহেবের চোখের দিকে তাকাল।

'কক্ষনো না, আংকেলকে দেখে কি মনে হয় তিনি খারাপ ছিলেন? আংকেল যে শুদ্ধ চরিত্রের একজন ব্যাচেলর ছিলেন, তা আংকেলকে দেখেই বোঝা যায়। তাই না আংকেল?' মনন বেশ শব্দ করে বলল কথাটা।

'অ্যা..., ইয়ে..., যা বলছিলাম, তোমরা মুখোশ পরো কেন?'

'ব্যাচেলরদের চেহারা দেখলেই বাড়িওয়ালারা প্রচণ্ড বিরক্ত হন, তাই বাড়ি ভাড়া নেওয়ার আগে বাড়িওয়ালাদের আমরা চেহারা দেখাতে চাই না। তাই এই মুখোশ পরা।' সোফায় খালিদ সুবহানের কাছাকাছি বসেছে প্রদীপ্ত। মনন ওকে তুলে দিয়ে ওইখানটায় বসল। তারপর খালিদ সুবহানের দিকে তাকিয়ে আবার ও বলল, 'সিলভিয়া নামে একটা মেয়ে ছিল আমেরিকার ভার্জিনিয়াতে। একটা ছেলেকে সে ভালোবাসত। কিন্তু ছেলেটা তাকে মোটেই গুরুত্ব দিত না। এতে সে বেশ অপমানিত বোধ করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে বেশ জেদীও হয়ে ওঠে। একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে সে তাই একদিন। প্রতিদিন সকাল বেলা সারা গায়ে অর্কিড মুড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে শুরু করে সে ছেলেটার বাড়ির গেটের সামনে। একদিন, দু দিন, তিন দিন...। দুই মাস তের দিন পর ছেলেটা সিলভিয়ার হাত ধরে বলে, চলো, গির্জায় যাই।' মনন হাসতে থাকে।

'বিয়ে করে ফেলে তারা?' খালিদ সুবহান সাহেব বেশ উচ্ছল হয়ে জিজ্ঞেস করেন।

'হ্যাঁ।'

'খুব ভালো তো!'

'লন্ডনের রাস্তায় হঠাৎ একদিন একটা লোককে দেখা যায়—সম্পূর্ণ ন্যাংটো হয়ে সে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। আবাসিক এলাকা, সবার চোখ বড় বড় হয়ে যায়। পুলিশকে খবর দেয় তারা এক সময়। পুলিশ এসে লোকটাকে ধরতেই তিনি চিৎকার করে বলেন, আজ নয়দিন ধরে আমার বাসার সুয়ারেজ লাইনটা বন্ধ হয়ে গেছে। যথাস্থানে খবর দিয়েছিলাম ছয়দিন আগে, কেউ মেরামত করতে আসে নাই। গতকাল আবার খবর দিয়েছি, তাও আসে নাই। শেষে অত্যন্ত রাগ আর অভিমান করে পোশাক ছেড়ে রাস্তায় নেমেছি। আর কিছু না হোক অন্তত পুলিশ এসে যেন আমাকে জিজ্ঞেস করে, কেন আমি এই কাজটা করেছি?' মনন থেমে গিয়ে খালিদ সুবহানের দিকে তাকায়।

'পুলিশ তারপর তার সুয়ারেজ লাইনটা মেরামত করার ব্যবস্থা করেছিল, না?' খালিদ সুবহান সাহেব খুব আনন্দ নিয়ে জিজ্ঞেস করেন মননকে।

'হ্যাঁ।' মনন উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'আবেল আবদুল্লাহ নামে এক তরুণ হঠাৎ একদিন বড় একটা লাইটপোস্টের ওপরে উঠে পড়ে। এলাকার সবাই চমকে সেটা দেখে। এগার হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ গেছে ওই লাইটপোস্ট দিয়ে। একটা ছোঁয়া লাগলেই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে সে মুহূর্তেই। সবাই চিৎকার করে বলে, ব্যাপার কী, আবেল? প্রথমে আবেল কানো কথা বলে না। বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেস করা পর সে বলে, বাবা-মাকে বলেছে তাকে বিয়ে করাতে। কিন্তু বাবা-মা কানে নিচ্ছে না তা। আজ কিছু একটা না বললে এই লাইটপোস্ট থেকে নামবে না সে।'

'তারপর?' খালিদ সাহেব চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে জিজ্ঞেস করেন।

'তার তিন দিন পর আবেলকে বিয়ে দেন তার বাবা-মা।' মনন দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, 'এখন হচ্ছে শো ডাউনের যুগ, এক্সপোজ করার

সময়। দেখেন না আংকেল, প্রার্থী যেই হোক, নির্বাচন এলেই মধুর মধুর কথাসম্বলিত পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে যায় এলাকা; আমাদের খেলোয়াড়রা যাই খেলুক. বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সময় অন্যরকম সাজে সেজে উঠেছিল সমস্ত ঢাকা; মানুষ ইদানিং তার নাম বলার আগে বলে আলহাজ, বীর বিক্রম, সমাজসেবক, আরো কত কী? আংকেল— ।' মনন গলাটা ভারী করে বলল, 'এই এলাকায় একটা বাসা দরকার আমাদের। কত জায়গায় গেলাম, ব্যাচেলর বলে কেউ ভাড়া দিতে চায় না। একজন তো বলেই ফেললেন, মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না ব্যাচেলরদের। খুব খারাপ লেগেছিল আংকেল। তারপর থেকে মুখে মুখোশ পরার সিদ্ধান্ত নেই আমরা।'

খালিদ সুবহান সাহেব মনটা কেমন যেন ভারী করে ফেলেন। তারপর কিছুটা নরম স্বরে বলেন, 'তোমরা বাড়ি ভাড়া নিতে চাও, এই তো?'

'জি।' সামী একটু সোজা হয়ে বসে বলল।

'এখন কয়টা বাজে?'

প্রদীপ্ত ওর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, '৪টা ১০ মিনিট।'

'ঠিক আছে, আমি একটু ভেবে দেখি, তোমরা ঠিক আধা ঘণ্টা পরে আসো।' খালিদ সুবহান সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আর শোনো. অন্যান্য বাড়িওয়ালাদের মতো আমি কিন্তু তোমাদের চেহারা দেখে বিরক্ত হতাম না।'

যুবেল সঙ্গে সঙ্গে সবার দিকে তাকিয়ে উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'কী, বলেছিলাম না, আংকেল অনেক ভালো মানুষ!'

'হ, আংকেল একজন মহান।' সামী বলল।

ঘরের কোনায় একটা পাথরের মূর্তির দিকে তাকিয়ে মনন বলল, 'আংকেল একজন কষ্টিপাথর।'

'না না আংকেল একজন— ।' প্রদীপ্ত হঠাৎ নিজের মাঝে উদ্দীপ্ততা এনে বলল, 'আংকেল একজন মহান্তঃকরণ।'

খালিদ সুবহান সাহেবের হাসি হাসি মুখটা হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল। হাসিটাকে তাজা করার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু পারছেন না। মাথার ভেতর কুটকুট করে কামরাচ্ছে— মহান্তঃকরণ মানে কী? মানেটা জানা নেই তার, এমনকি এই শব্দ তিনি কখনো শোনেনওনি। জীবনে এই প্রথম

শুনলেন। কিছু বুঝতে না পেরে, মাথা এদিক-ওদিক করতে করতে, বিড়বিড় করে বললেন তিনি, 'গালি দিলো না তো!'

সাদিদ আড়চোখে মেয়েটার দিকে তাকাল। উদাস হয়ে তাকিয়ে আছে মেয়েটা সামনের দিকে, যেখানে কিছু নেই, শূন্য, কেবল ভেজা তুলোর মতো মেঘগুলো ভেসে যাচ্ছে এদিক-ওদিক।

খুব ধীরপায়ে আরো একটু এগিয়ে গেল সাদিদ ছাদের কোনাটার দিকে। কিছুটা দূরুত্বে দাঁড়িয়েই বোঝার চেষ্টা করল পারিপার্শ্বিকতা। কোনো অসামঞ্জস্যতা খুঁজে পেল না সে। আরো একটু পাশ ঘেঁষে কিছুটা শংকিত গলায় মেয়েটাকে বলল, 'জানেন, কিছুক্ষণ আগে একটা মেয়ে মারা গেছে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে!'

সরল চাহনিতে মেয়েটা একপলক সাদিদের দিকে তাকাল, কিছু বলল না সে। হঠাৎ, ছাদের এই নির্জনতায়, কারো গলার স্বর শুনে যেরকম চমকে ওঠার কথা, সেরকম চমকালও না মেয়েটা। সাদিদ জানে, মেয়েদের দুটো না, তিনটে চোখ। শরীরের সামনের দু চোখ দিয়ে তারা যা দেখে, তার চেয়ে বেশি দেখে তাদের ভেতরে যে চোখটা আছে, তা দিয়ে।

'এই তো ঘণ্টা তিনেক আগে একটা মা বাসে চাপা পড়েছেন তার দুটো সন্তানকে নিয়ে। রাস্তার মাঝেই সব শেষ হয়ে গেছে তাদের। ঘটনাটা খুব হৃদয়বিদারক, না?' সামনের দিকে তাকিয়েই সাদিদ বলল।

কিছু বলল না মেয়েটা, এবারও। আগের মতোই তাকিয়ে রইল সামনের দিকে। কেবল ঝিরিঝিরি বাতাসে উড়তে থাকা তার মাথার চুলগুলো হাত দিয়ে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করল সে। পারল না, উড়তে লাগল সেগুলো মুক্ত মনেই। সাদিদ খুক করে কেশে মেয়েটার দিকে আরো একটু সরে এলো। আড়চোখে আবার তাকাল, 'এই যে, এই যে আপনার সামনে দিয়ে একটা প্রজাপতি উড়ে গেল, লাল-নীল পাখা মেলে হাওয়ায় ভেসে গেল, ঠিক এই সময়টাতেই মারা গেছে সাড়ে আট হাজার মেয়ে, স্রেফ মা হতে গিয়ে। খবরটা ভয়ানক, তাই না?'

ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটি। সাদিদের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল, 'আপনি আমাকে এই খারাপ খারাপ কথা শোনাচ্ছেন কেন?'

চেহারাটা হাসি হাসি করে ফেলল সাদিদ, 'মন খারাপ হয়ে গেল আপনার!'

'মন খারাপ করার মতো কথা না এগুলো?'

'অবশ্যই।' সাদিদ আগের চেয়ে হেসে বলল, 'কিন্তু আনন্দের ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি, আপনি এখনো বেঁচে আছি। আমাদের বন্ধুরাও বেঁচে আছে, আপনার বন্ধুরাও বেঁচে আছে।'

'নিজে বেঁচে থাকাটা কি খুব আনন্দের?'

'আনন্দের। প্রবল ঝড়ের মাঝে সব ডাল-পালা-পাতা হারিয়েও যে গাছটা দাঁড়িয়ে থাকে, ওই গাছটা কদিন পর আবার যখন নতুন পাতা জাগায় নিজের বুকে, আস্তে আস্তে বাড়িয়ে নতুন বাহু, ওটাই আনন্দের।' সাদিদ আরো পাশ ঘেঁষে এসে বলল, 'মানুষের জীবনটাও এরকম। এখানে কষ্ট আছে, অপমান আছে, ঘৃণা আছে, বর্বরতা আছে, প্রতারণা আছে, অনেক কিছু আছে। এসব ঘিরেই যে জীবন, সেটাই আনন্দের জীবন, আনন্দময় বেঁচে থাকা।'

'আমাকে দেখে আপনার এসব কথা মনে হচ্ছে কেন?'

সাদিদ মাথাটা নিচু করে আবার তুলে বলল, 'তার আগে আমরা কি আমাদের নামটা জানতে পারি?' সাদিদ উত্তর পাওয়ার আগেই বলল, 'আমি সাদিদ, সাদিদ নাজমুস।'

মেয়েটা আবার শূন্য দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি অর্না।'

'শুধু অর্না?'

'অর্না তাবাসসুম।'

'আপনি অনেকক্ষণ ধরে ছাদে দাঁড়িয়ে আছেন। আমিও অনেকক্ষণ ধরে এই ছাদে এসেছি। মানুষের দাঁড়ানোর ভঙ্গি বলে দেয়, তার মনটা কেমন আছে।' সাদিদ মুচকি হেসে বলল, 'আপনার মনটা ভালো নেই। মন ভালো না থাকার হাজারটা কারণ থাকতে পারে, কিন্তু মন ভালো রাখার জন্য একটা কারণই যথেষ্ট, সেই কারণটা হলো—এত কিছুর পরও বেঁচে থাকা, কারুকাজময় মেঘ দেখতে পাওয়া, আকাশ ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছেটা থাকা। অর্না।' সাদিদ একটু থেমে বলল, 'জীবনে যদি দুঃখই না আসলো, তাহলে আনন্দ বলে যে ব্যাপারটা আছে, সেটা বুঝবেন কীভাবে? ' সাদিদ সোজা হয়ে দাঁড়াল, 'বাংলা সিনেমা দেখেছেন কখনো?'

'না।' ছোট্ট করে উত্তর দিল অর্না।

'বাংলা সিনেমার কিছু কমন দৃশ্য আছে।'

'যেমন?' কিছুটা আগ্রহী হয়ে বলল অর্না।

'কলেজে পড়ে নায়িকা। গেট দিয়ে কলেজে ঢুকছে সে। কলেজের সবার সালোয়ার-কামিজ পরা, কিন্তু সে পরে এসেছে স্কার্ট। এত বড় একটা মেয়ে স্কার্ট পরেছে, ব্যাপারটা সবার নজরে এলো, নজরে এলো ওই কলেজের এক ছাত্রেরও, সে আবার এই সিনেমার ভিলেন।

কলেজ শেষে ভিলেন নায়িকার সামনে এসে দাঁড়াল। কিছু কথা বলল, অশ্লীল ইঙ্গিত করল। সঙ্গে সঙ্গে নায়িকা দৌড়াতে লাগল।

নায়িকা দৌড়াচ্ছে, পেছনে প্রধান ভিলেনসহ আরো তিন-চার জন। তারা দৌড়াচ্ছে..., তারা দৌড়াচ্ছে...। নায়িকাও মাশাল্লাহ বেশ স্বাস্থ্যবান, ভিলেনেরও ইয়া বড় ভুঁড়ি। কিন্তু তারা এত জোরে দৌড়াচ্ছে যে, এভাবে দৌড়ানোটা কোনো ব্যাপারই না। হঠাৎ নায়িকা পড়ে গেল, ভিলেন ও তার সাগরেদরা ঘিরে ফেলল তাকে। ভিলেন কান পর্যন্ত হাসি হেসে এগিয়ে গেল নায়িকার দিকে, তারপর হাত ধরল তার। সঙ্গে সঙ্গে নায়িকা এমন জোরে ঘুষি মারল, ভিলেনসহ সাগরেদরা ছিটকে পড়ল চারপাশে।

আবার দৌড়াতে শুরু করল নায়িকা। তার পায়ে পেন্সিল হিল, পরনে টাইট হাফ স্কার্ট, তবু দৌড়াতে তার মোটেই কষ্ট হচ্ছে না। আমরা একটু দৌড়ালেই যেখানে ঘামে মুখ ভরে যায়, কিন্তু নায়িকার চেহারায় কোনো ঘাম নেই! লিপস্টিক, মেক-আপ সব ঠিক আছে, আগের মতোই।

আশপাশের অনেক মানুষ এটা দেখছে—একটা মেয়ে দৌড়াচ্ছে, তার পেছনে পেছনে চার-পাঁচটা পুরুষ দৌড়াচ্ছে, কিন্তু কেউ কিছু বলছে না! সবাই স্বাভাবিকভাবে যার যার কাজ করছে।

নায়িকা আবার পড়ে গেল। এবার ভিলেন আষ্টেপৃষ্ঠে ধরল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে নায়িকা বলল, ছেড়ে দে শয়তান। তোর কি মা-বোন নেই?

ভিলেন মুহাহাহা করে হাসতে হাসতে বলল, আছে সুন্দরী আছে, কিন্তু কোনো বউ নাই।

শয়তান, তুই আমার দেহ পাবি, কিন্তু মন পাবি না। নায়িকা চিৎকার করে বলল। ভিলেন কিন্তু চিৎকার করল না, চুইংগাম চিবোতে চিবোতে বলল, মন দিয়ে কী করব আমি, আমার তো ওইটাই দরকার। সঙ্গে সঙ্গে

নায়িকা আগের চেয়ে চিৎকার করে ওঠে, বাঁচাও বাঁচাও... । ভিলেন মুহাহাহা করে বলে, তোকে কেউ বাঁচাতে আসবে না সুন্দরী । যে আসবে তাকে পিষে ফেলব আমি! কিন্তু হঠাৎ ঝড় ওঠার মতো শব্দ হবে । পর্দায় দেখা যাবে দুটো পা উড়ে আসছে এবং পা দুটো আঘাত করছে ভিলেনকে ।

বেশ কয়েক মিনিট মারামারি হবে তারপর । নায়ক একাই পাঁচ-ছয়জনকে মেরে ঠাণ্ডা করে ফেলবে । কিন্তু ভিলেনরা পালিয়ে যাওয়ার সময় নায়কের হাতে একটা আঘাত করে যাবে ছুরি দিয়ে । রক্ত বের হতে থাকবে সেখান থেকে । নায়িকা তাই দেখে দ্রুত নিজের গায়ের জামা ছিঁড়ে নায়কের হাত রেঁধে দেবে । তারপর নায়ক নায়িকার দিকে তাকাবে, নায়িকা নায়কের দিকে তাকাবে । কেমন যেন একটা ঘটনা ঘটবে তখন । পরের দৃশ্যে দেখবেন ভুঁড়িওয়ালা নায়ক আর ভুঁড়িওয়ালি নায়িকা দাপাতে দাপাতে নাচছে আর চিৎকার করার মতো গান গাচ্ছে । এই দৃশ্যটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে আপনি নিজেই তখন চিৎকার করে বলবেন, বাঁচাও...বাঁচাও... ।'

ফিক করে হেসে ফেলল অর্না । সঙ্গে সঙ্গে সাদিদ বলল, 'এটা হচ্ছে আলো, জীবনকে পথ দেখানোর আলো । আপনি কি জানেন, একটা হাসিমাখা মুখ আর একটা কান্না-মাখা মুখের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?'

মাথা এদিক-ওদিক করল অর্না ।

'হাসিমাখা মুখ দিয়ে আলো বের হয়, কান্নামাখা মুখ দিয়ে বের হয় মানুষের অসহায়ত্ব ।' সাদিদ হেসে উঠে বলল, 'আপনার কাছে আমার একশ টাকা পাওনা রইল । কারণ এই সিনেমা দেখতে গেলেই কমপক্ষে একশ টাকা খরচ হতো আপনার । আবার যখন দেখা হবে আপনার সঙ্গে, তখন আপনি ওই একশ টাকা থেকে মাত্র পাঁচটা টাকা দেবেন আমাকে, রাস্তায় লাল কাপড়ে মোড়ানো পাত্রে কুলফি বরফ বিক্রি করে না, একটা কুলফি কিনে খাব আমি ।'

চোখ মেলে এই প্রথম সাদিদের দিকে তাকাল অর্না । সাদিদ তাকিয়ে আছে মেঘের দিকে । অর্না অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'এখানে বাসা কোথায় আপনার?'

'আমার বাসা তো এখানে না । আমরা পাঁচজন বন্ধু মিলে এই বিল্ডিংয়ের একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে এসেছি । মাত্র কয়েকদিনের জন্য । আমার চার বন্ধু নিচে কথা বলছে বাড়িওয়ালার সঙ্গে

'বড় চাচ্চুর সঙ্গে।'

'জি।'

'সাভারের মতো এই মফস্বল এলাকায় কেন ভাড়া নিতে এসেছেন আপনারা?' অর্না খুব আন্তরিকতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল।

'ওরা এসেছে আমার জন্য, আর আমি এসেছি— ।' সাদিদ চেহারাটা ম্লান করে বলল, 'সেটা তো বলা যাবে না।' শব্দ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সে। অর্না কী একটা বলতে নেয়, কিন্তু পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখে, ছাদের গেটের দিকে চলে গেছে সাদিদ। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে সে নিচের দিকে।

তামিয়া শব্দ করে নাতাশা মুমতাজের বেডরুমে ঢুকে বলল, 'আম্মু আম্মু, তোমার ছেলের কাণ্ড দেখেছ?'

নাতাশা মুমতাজ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ফারুবের কাণ্ড পরে দেখছি। তার আগে বল, মুরগির মতো চিৎকার করছিস কেন তুই!'

'চিৎকার কী আর সাধে করছি! সেই কখন থেকে এককাপ চা খাব, কিন্তু তোমার ছেলে দুটো চুলোই আটকে রেখেছে। বলি, এককাপ চা বানিয়েই চলে যাব, কিন্তু ওর এক কথা—পাঁচ মিনিট পর, পাঁচ মিনিট পর। আধাঘণ্টা ধরে ও এই একই কথা বলছে! '

'তোমরা দুই ভাই বোন তোমাদের মতোই আছো। একজন আছে কীসব রান্না নিয়ে, আর তুমি আছো তোমার মোবাইল নিয়ে। মোবাইলে মানুষ সারাক্ষণ কথা বলে কীভাবে!' বিরক্ত হয়ে বলেন নাতাশা মুমতাজ।

'আমি এমনি এমনি কথা বলি! কয়দিন পর পরীক্ষা, হঠাৎ ছুটি হয়ে গেল ভার্সিটি। আমার এক বান্ধবীর কাছ থেকে সাজেশন নিচ্ছিলাম।'

'তাই!' নাতাশা মুমতাজ অভিমানী গলায় বলেন, 'তুমি কি মনে করো আমি একদিন তোমার বয়সী ছিলাম না! তোমার মোবাইলের ওপাশের জনকে তুমি এরই মধ্যে আট-দশবার আই লাভ ইউ বলেছ। বান্ধবীকে কেউ এতবার আই লাভ ইউ বলে? ভার্সিটি থেকে ছুটিতে তোমরা বাসায় এসেছ, বাবা-মার সঙ্গে একটু গল্প করবে, তা না, যার যার মতো আছো।' মেয়ের চোখের দিকে তাকান নাতাশা মুমতাজ, 'সুমী কোথায়?'

'কোথায় আর থাকবে, টেলিভিশন দেখছে।' তামিয়া ঠোঁট উল্টিয়ে বলল, 'তোমার কাজের মেয়েটাও মাশাল্লাহ।

'শোনো— ।' নাতাশা মুমতাজ মেয়ের কাছ ঘেঁষে এসে কিছুটা ফিসফিস করে বলেন, 'আজকাল ভালো কোনো চাকরি পাওয়া আর সাধারণ

কোনো কাজের মেয়ে পাওয়া একই কথা! ও আছে বলেই তাও একটু আরাম করতে পারি, না হলে খেটে মরতে হতো। আর তোমার বাবার যা খুঁতখুঁতে স্বভাব!'

'কাজের মেয়েকে এভাবে প্রশয় দিও না! প্লিজ।' এমনিতে মাথায় উঠেছে, কয়দিন পর মাথায় বসেই টিভি দেখতে চাইবে।'

তামিয়ার মোবাইলটা হঠাৎ বেজে ওঠে। নাতাশা মুমতাজ আগের চেয়ে বিরক্ত হয়ে বলেন, 'যাও, ফোন রিসিভ করো, আর আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ বলো!'

মোবাইলটা কেটে দিয়ে মার পাশে গিয়ে দাঁড়াল তামিয়া। দু হাত দিয়ে মায়ের একটা হাত চেপে ধরে কাঁধে মাথা রেখে বলল, 'আই লাভ ইউ, আম্মু। তোমাকে একটা আনন্দের কথা বলব এখন। আজ নয়দিন হলো অর্না এখানে এসেছে। এই প্রথম আজ ওর মুখে একটু হাসি দেখলাম।'

রান্নাঘরে না ঢুকে দরজার সামনে দাঁড়িয়েই নাতাশ মুমতাজ বললেন, 'ফারুব, পাঁচ সেকেন্ডর মধ্যে তুই এখান থেকে বের হয়ে যাবি।'

'সিওর, আম্মু। তবে পাঁচ সেকেন্ড না, পাঁচ মিনিট।' ফারুব ওর বাম হাতের সব আঙুল দেখিয়ে বলল, 'মাত্র পাঁচ মিনিট!' নাতাশা মুমতাজ বিরক্ত হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই ফারুব বলল, 'একটা জিনিস বুঝতে পারছি না আম্মু, একটু বুঝিয়ে দাও তো।'

'তার আগে আমাকে বুঝিয়ে দে — তুই পড়ছিস মেডিকেলে, কিন্তু হঠাৎ রান্না নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লি কেন, বল তো?'

'তোমার কি মনে হয় না — রান্না একটা শিল্প?'

'শিল্প। কিন্তু একজন হবু ডাক্তার রান্না-বান্না নিয়ে থাকবে এটা কেমন কথা!' নাতাশা মুমতাজ কপাল কুঁচকে বলেন, 'আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।'

চুলার ওপর একটা পাত্রে কী যেন গরম হচ্ছে, সেখানে কয়েকটা সবুজ পাতা ছেড়ে দিয়ে ফারুব বলল, 'তুমি কি জানো পৃথিবীর অনেক ডাক্তার চিকিৎসা পেশায় না গিয়ে অন্য পেশায় জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন?'

'তুইও কি অন্য পোশায় যেতে চাচ্ছিস নাকি?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না।' ফারুব হঠাৎ মায়ের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে নাতাশা মুমতাজ বলেন, 'মুখে এসব কি মেখেছিস তুই?'

'নিম পাতা।'

'নিম পাতা!'

ফারুব মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'অবাক হচ্ছো কেন, আম্মু!' খুক করে একটু কেশে কিছুটা বিজ্ঞাপনি ঢংয়ে সে বলল, 'নিম পাতাকে বলা হয় যম পাতা, জীবাণুর যম। আমাদের মুখের চামড়ায় অনেক ছোট ছোট জীবাণু লুকিয়ে থাকে, যা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। কিন্তু নিম পাতা সেটা দেখতে পায় এবং দেখতে পেয়ে সেই জীবাণুগুলোকে নিমিষেই ধ্বংস করে ফেলে আর মুখের চামড়াকে করে জীবাণুমুক্ত, ১০০% ক্লিয়ার।' ফারুব হেসে ফেলল, 'আম্মু, তুমি কি একটু লাগাবে? তারপর কিছুক্ষণ রোদে বসে থাকার পর দেখবে তোমার মুখের চামড়া হয়েছে আরো নমনীয়, কমনীয়, তুমি আরো ফর্সা হয়ে চারদিক করছো আলোকিত, সুবাসিত।'

নাতাশা মুমতাজ রেগে গিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই ফারুব মায়ের একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'রাগ করছো কেন তুমি!' তারপর একটু থেমে বলল, 'তুমি খুব ভালো করে জানো—আমি কী। তোমার মনে আছে, ক্লাস নাইনে পড়ার সময় আমি একটা যাত্রাদলে চলে যেতে চেয়েছিলাম। তুমি পাগলের মতো চিৎকার করে উঠেছিলে বলে আমার আর যাওয়া হয়নি। ইন্টার পরীক্ষার পর আমি কোনো একটা জাহাজে চাকরি নিতে চেয়েছিলাম, সারাক্ষণ পানির ওপর থাকতে পারব, এই আনন্দে বুদ হয়ে ছিলাম। সেখানেও যাওয়া হয়নি। তিন-চার বছর আগে প্রচণ্ড শীত পড়েছিল। এক বুড়ো রিকশাওয়ালাকে পাতলা একটা শার্ট গায়ে দিয়ে রিকশা চালাতে দেখে আমার ওয়ারড্রবের সব গরম কাপড় তাকে দিয়ে দিয়েছিলাম। তুমি অবশ্য না করোনি এ ব্যাপারটাতে। বুড়ো রিকশাওয়ালাটাও দুটো কাপড় নিয়ে বাকীগুলো ফেরত দিয়েছিলেন আমাকে।' ফারুব হাসতে হাসতে বলল, 'মা রে, সংসারে কেউ কেউ একটু পাগলামি করতে ভালোবাসে। সবার মাঝে পারফেকশন থাকবে, এটা ঠিক না। যে পাগলামি করতে চায় তাকে একটু পাগলামি করতে দেওয়া উচিত। সেই আমলে বিএ পাশ করে জীবনানন্দ দাশ কোনো চাকরি করেননি, করেননি ঠিক না, করতে পারেননি। সারাজীবন কবিতা লিখে গেছেন, শেষে অপঘাতে মারা গেছেন!' মায়ের হাতটা আরো একটু জোরে চেপে ধরে ফারুব বলল, 'একটা কবিতা বলি।'

ছেলের হাতটা এবার নিজেই চেপে ধরলেন নাতাশা মুমতাজ। দু চোখ হাসিতে ভরিয়ে ফেলেন তিনি। ফারুব গলাটা গম্ভীর করে বলল—

কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী—
আমি বহে আনি;
একদিন শুনেছ যে-সুর—
ফুরায়েছে,—পুরানো তা—কোনো এক নতুন-কিছুর
আছে প্রয়োজন,
তাই আমি আসিয়াছি,—আমার মতন
আর নাই কেউ!'

'খুব সুন্দর।' নাতাশা মুমতাজ বেশ উৎফুল্ল হয়ে বললেন।

'মুখোশ পরে কিছুক্ষণ আগে চারটা ছেলে এসেছিল না আব্বুর কাছে, ওটা কিন্তু ওদের পাগলামি ছিল না। বাড়িওয়ালাদের কাছ থেকে বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়ে শেষে ওরা এই বুদ্ধিটা বের করেছে। এবার তোমাকে একটা সত্যি কথা বলি—।' ফারুব মায়ের কাঁধে মাথা রেখে বলল, 'হোস্টেলে মাঝে মাঝে রান্না করে খেতে ইচ্ছে করে। বাইরের খাবার খেতে খেতে অনেকদিন ভীষণ অরুচি লাগে। তুমি এবার জিজ্ঞেস করতে পারো, এত কিছু থাকতে তাহলে নিম পাতা রান্না কেন? কয়েক বছর আগে মঙ্গার সময় কুড়িগ্রামের কয়েকটা পরিবার ভাতের সঙ্গে স্রেফ নিম পাতা ভাজি করে খেয়েছিল। খুব খারাপ লেগেছিল কথাটা শুনে, আজ হঠাৎ মনে পড়ায় রেঁধে খাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম আর কি। কিন্তু—।' ফারুব মুখ বিকৃত করে বলল, 'ওই সিদ্ধ নিম পাতা কী করব, শেষে বেটে মুখে লাগিয়েছি। তুমি তো জানো, নিম পাতার একটা ভেষজ গুণ আছে।'

নাতাশা মুমতাজ একটু এগিয়ে গিয়ে পেশানো কিছু নিমপাতা হাতে নেন। তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আমার ছেলের সম্মানার্থে I want to put it on my face.

ফারুব মুগ্ধ হয়ে বলল, 'সেই কবে ইংরেজির শিক্ষক ছিলে তুমি, আমাকে আর তামিয়াকে নিজে পড়াবে বলে স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিলে! কিন্তু ইংরেজিটা এখনো কী চমৎকার করে বলো তুমি! আই প্রাউড অব ইউ, আম্মু।'

খালিদ সুবহান সাহেব কিছুটা চিৎকার করে বললেন, 'সুমী, অনেকক্ষণ ধরে তোকে ডাকছি, কানে শুনতে পাস না?' সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেলে মোলায়েম গলায় বললেন, 'কিরে, তোকে না কখন ধরে ডাকছি আমি।'

টিভি দেখছে সুমী। হিন্দী সিরিয়ালের শাঁই শাঁই শব্দ হচ্ছে। খুব সংকটময় মুহূর্ত, চোখ সরালেই দারুণ কিছু মিস হয়ে যাবে। সুমী টিভির দিকে তাকিয়েই বেশ বিরক্ত গলায় বলল, 'কিউ—কেন?'

'এককাপ চা খাব আমি।'

'নেহি—এখন তো চা খাওয়ার সময় না, মামা!'

খালিদ সুবহান সাহেব রাগতে নিয়েই মুখটা আবার হাসি হাসি করে বললেন, 'এখন কি হিন্দী সিরিয়াল দেখার সময়? এই জিনিস তুই রাতেও দেখেছিস! কী, দেখিসনি?'

'সাচ—সত্য। কিন্তু ভালো জিনিস বারবার দেখতে হয়।'

'হিন্দী সিরিয়াল ভালো জিনিস হলো!'

'আপনি যে ডিসকভারি চ্যানেলে হাতি-ঘোড়া-বাঘ-ভালুকের নাচ দেখেন, ওদের মারামারি, খাবলা-খাবলি দেখেন, সেটা ভালো জিনিস! বানররা যে বানরগিরি করে সেটা ভালো জিনিস!' সুমী টিভির দিকেই তাকিয়েই বলল।

খালিদ সুবহান সাহেব কিছু বললেন না আর। ফিরে এলেন বেডরুমে। দ্রুত ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, একটু পর হাসতে শুরু করলেন। হাসতে হাসতে তিনি পায়চারি করছেন, আবার একটু পর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকেন। বিছানা ঠিক করতে করতে ব্যাপারটা দেখে নাতাশা মুমতাজ বললেন, 'আপনি কী পাগল হয়ে যাচ্ছেন?'

খালিদ সুবহান সাহেব পায়চারি বন্ধ করে স্ত্রীর দিকে গভীর চোখে তাকালেন, 'পাগল হয়ে যাচ্ছি কি ফারুবের মা, সম্ভবত হয়ে গেছি। দেখি, তোমার একটা হাত দাও তো দেখি, একটা কামড় দেই।' খালিদ সাহেব হাত এগিয়ে দিয়ে খপ করে স্ত্রীর একটা হাতে চেপে ধরেন। সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা চিৎকার করে ঝাঁকুনি দিয়ে হাত সরিয়ে নেন নাতাশা মুমতাজ। তারপর গজরাতে গজরাতে বের হয়ে যান ঘর থেকে।

স্ত্রীর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে মেজাজটা খারাপ করে ফেলেন খালিদ সাহেব। পরক্ষণেই হাসতে শুরু করেন তিনি। কিন্তু ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে থমকে যান। তামিয়া দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। বাবার দিকে এগিয়ে এসে সে বলল, 'আব্বু, তুমি এরকম করছো কেন বলো তো?'

'মারে, আমি যে পাগল হয়ে গেছি।'

'কে বলল তুমি পাগল হয়ে গেছো?'

'আমার নিজেরই মনে হচ্ছে আমি পাগল হয়ে গেছি। কিছুক্ষণ আগে তোর মায়ের হাত কামরাতে ইচ্ছে করছিল আমার।'

'পাগল হলে মানুষের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে এটা তোমাকে কে বলল?' তামিয়া বাবার আরো একটু কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল।

'কেউ না।'

'তাহলে?'

রাগতে নিয়েই আবার হাসতে থাকেন খালিদ সাহেব, 'আমার এখন সব কামড়াতে ইচ্ছে করছে মা। এই চেয়ার, টেবিল, সোফাসেট, টিভি, ফ্রিজ— সবকিছু। একটু আগে গা মোছার তোয়ালেটা বারান্দায় টান টান করে মেলে দিলাম, এখন দেখি ভাঁজ হয়ে আছে তোয়ালেটা। মাথা গরম হয়ে গেল। পেপার পড়তে গিয়ে দেখি মাঝখানের দুটো পাতা নেই, স্রেফ গায়েব হয়ে গেছে। পত্রিকাটা রেখে দেওয়াও হয়েছে এলোমেলোভাবে। ডায়নিং টেবিলের ওপর পানি পড়ে চ্যাটচ্যাট করছে। সুমীকে বললাম, একটু চা বানিয়ে দিতে। ও আমাকে হিন্দী শোনাচ্ছে। হিন্দী সিরিয়াল দেখতে দেখতে মাথাটা গেছে ওর! '

'তোমার কি এসব ছোট ছোট জিনিসের প্রতি নজর দেওয়া ঠিক, আব্বু?' কিছুটা কাতর গলায় বলল তামিয়া।

'আমি তো জানি এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসের প্রতি আমার মতো মানুষের নজর দেওয়া ঠিক না। এটা একটা রোগের মতো। সারাক্ষণ খুঁতখুঁত করলে হার্টে চাপ পড়ে। অলরেডি আমার পড়েও গেছে। ডাক্তার তো বলেই দিয়েছে সব সময় আনন্দে থাকতে, হাসি-খুশি থাকতে।'

'তোমার তো এখন আনন্দেই থাকার কথা, আব্বু।'

'হ্যাঁ, আমার তো কোনো দুঃখ নেই, আমার একমাত্র ছেলে মেডিকেলে পড়ে, একমাত্র মেয়ে ভার্সিটিতে পড়ে। কদিন পর ওরা নিজেরা নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। আমার যা আছে, তোর মাকে নিয়ে সারাজীবন কেটে যাবে আমার, শেষ হবে না। সাভারের এই ছায়াঘেরা জায়গায় একটা বাড়ি করেছি, বেশ শান্তিতেই আছি। ডাক্তারের পরামর্শ মতো কারণ-অকারণে হাসছি। কিন্তু— ।' থেমে যান খালিদ সাহেব।

'তুমি একটু চুপ করে বসো তো।' বাবার একটা হাত ধরে তামিয়া।

'আমার এখন বসতেও ইচ্ছে করছে না রে, মা।'

'ঠিক আছে, তোমাকে বসতে হবে না। তুমি একটু স্থির হয়ে দাঁড়াও, তারপর ভাবো তো তোমার আসলে এখন সত্যি সত্যি কি করতে ইচ্ছে করছে।' বাবাকে সোফার কাছে নিয়ে যায় তামিয়া। কিন্তু সেটাতে না বসে কী যেন ভাবতে থাকেন খালিদ সাহেব। তারপ কিছুটা বিড়বিড় করে বলেন, 'আমার ইচ্ছে করছে... আমার ইচ্ছে করছে... মারে, আমার এখন কি ইচ্ছে করছে তাও বুঝতে পারছি না!'

দু পা গুটিয়ে, সোফাসেটের কাছে বসে, একটা হাত সোফার গদিতে তুলে দিয়ে, আয়েশ করে এখনো টিভি দেখছে সুমী। সিরিয়ালের এ পর্বের শেষ মুহূর্ত। ক্লাইমেক্স, সাসপেন্স আর কান্নার জলে ভেসে যাচ্ছে টিভি স্ক্রিন। ভেসে যাচ্ছে সুমীও। তামিয়া হঠাৎ টিভিরুমে ঢুকে গলা গম্ভীর করে বলল, 'সুমী?'

তামিয়ার দিকে না তাকিয়ে হাত দিয়ে ইশারা করে সুমী বলল, 'প্লিজ আপা, এখন ডিস্টার্ব না করলে মে খুশরাহু—আমি খুশি হবো।'

'কী!

তামিয়ার দিকে এবারও তাকাল না সুমী, 'আমি এখন খুব ব্যস্ত, আপা— মে বহুত বিজি হু।'

'এসব কী বলছিস তুই?'

সুমী এবার ঘুরে তাকায় সুমীর দিকে, 'অ আল্লা, আপা দেখি হিন্দী-টিন্দী কিছুই বোঝে না!

'তুই খুব বুঝিস?'

'মে বহুত আচ্ছা সামাঝতাহু—আমি খুব ভালো বুঝি, আপা।'

'বাবা একটু চা খেতে চেয়েছেন, তুই সেটা না বানিয়ে দিয়ে এখানে বসে টিভি দেখছিস?'

'বহেনজি, আমি খুব ভোরে উঠে সকাল পর্যন্ত যখন কাজ করেছি, তখন কিন্তু সবাই ঘুমিয়ে ছিল!'

'কী বললি?'

'রাগ করছেন কেন, আপা! দুনিয়ার সবাই চাকরিতে আট ঘণ্টা ডিউটি করে। তার মধ্যে আবার এক ঘণ্টা লাঞ্চ ব্রেক। কিন্তু বাসার কাজের মানুষগুলা সেই যে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে কাজ শুরু করে, গভীর রাত পর্যন্ত সংসারের যাবতীয় কাজ শেষ করে তারপর ঘুমাতে যায়। আপনি কী বলেন—কাজের মেয়েরা মানুষ না? মামা নিজেই তো বলেছে, সব মানুষের সমান অধিকার। রান্নাঘরে আমার রুটিন টাঙানো আছে, আপনি গিয়ে দেখেন—এখন আমার কাজ করার সিডিউল না, এখন টিভি দেখার সিডিউল। আপ সামঝে কেয়া, বেহেনজি?'

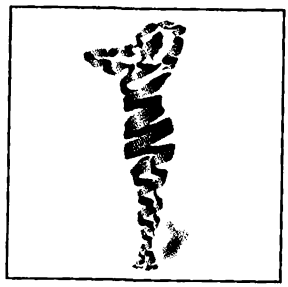

বাতেন সরকার সাহেব সামীর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'খালিদ সাহেবের বাসায় ভাড়া থাকি আমি। আমার নাম বাতেন সরকার। বেশ কিছুক্ষণ ধরে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছি তোমাদের, কোনো সমস্যা?'

'ঠিক সমস্যা না, আংকেল। ওনার একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে এসেছি আমরা। প্রাথমিক কথাও হয়েছে। ৪টা ৫০ মিনিটে আবার ওনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন তিনি।' সামী ওর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'হাতে আর দশ-বারো মিনিট সময় আছে আমাদের।'

'খুব ভালো মানুষ খালিদ সাহেব। তবে একটু পাগলাটে ধরনের। সরল মানুষগুলো একটু পাগলাটেই হয়। উনি বাড়িওয়ালা, আমি ভাড়াটে, ওনার আচরণে এটা বোঝাই যায় না। প্রতিদিন বিকেলবেলা একসঙ্গে চা খাই আমরা। সাত-আট মাস হলো এখানে এসেছি, একদিন বাদ গেলেই মাইন্ড করেন তিনি। ইদানিং হার্টে একটু সমস্যা হয়েছে ওনার। ডাক্তার হাসি-খুশি থাকতে বলেছেন তাকে। তাই সব সময় মুখে হাসি লেগেই থাকে তার এখন। ওনার সঙ্গে থাকতে থাকতে আমিও যখন-তখন হাসতে শুরু করছি।' বাতেন সাহেব বেশ উৎফুল্ল হয়ে বলেন, 'আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, উনিসহ আমরা যারা ভাড়াটে আছি, তারা মিলে একটা হাসি ক্লাব গঠন করব। প্রতিদিন সকালে আমরা সবাই মিলে হাসব। বুকের সব বাতাস বের করে হাসব, আবার হাসা শেষে বুক ভরে সজীব নিঃশ্বাস নেব, অক্সিজেন নেব।'

'খুবই ভালো আইডিয়া।' যুবেল হাসি হাসি মুখ করেই বলল, 'আমরা যদি এখানে থাকতে পারি, তাহলে আমরাও হাসি ক্লাবে যোগ দেব।'

'ইনশাল্লাহ, হাসতে হাসতে আশপাশের এলাকা কাঁপিয়ে ফেলব।' মননও হাসতে হাসতে বলল, 'একদিন এ বাড়িটার নাম হয়ে যাবে হাসিবাড়ি।'

'তা তোমাদের নাম জানা হয়নি আমার।' বাতেন সরকার হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত এগিয়ে দিলেন। হাত মেলাতে মেলাতে সবাই নিজের নাম বলল। শেষে সামী হাত মেলাচ্ছিল। বাতের সরকার তার হাতটা চেপে ধরে বললেন, 'তোমাদের বয়সে কত কী করেছি! মাঝে মাঝে ভাবি, যদি আবার সেই দিনগুলি ফেরত পেতাম। ভালো কথা— ।' বাতেন সরকার কিছুটা ইতস্তত ভঙ্গিতে বললেন, 'সকালে নাস্তা করার পর দেখি সিগারেটের প্যাকেটটা খালি। আমি চার তলায় থাকি তো, নামতে ইচ্ছে করছিল না। একটু পর অবশ্য খালিদ সাহেবের কাছে যাব, চা খাব। কিন্তু উনি সিগারেট খান না, সিগারেট খাওয়া পছন্দও করেন না। তা তোমাদের মধ্যে কেউ সিগারেট খায় নাকি?'

শব্দ শুনে দরজা খুলে দিল তামিয়া। সঙ্গে সঙ্গে মনন কিছুটা অবাক হয়ে বলল, 'আমরা কি ঠিক জায়গায় এসেছি, মানে এটা কি ৩৩০ নং বাসা?'

'জি আপনারা ঠিক জায়গায় এসেছেন, এটা ৩৩০ নং বাসা।' দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে তামিয়া বলল, 'সম্ভবত আপনারা আব্বুর কাছে এসেছেন, বসুন, আব্বুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'এক্সকিউজ মি— ।' ভেতরের ঘরে চলে যাচ্ছিল তামিয়া। ঘুরে দাঁড়াল সে। সামী হাসতে হাসতে বলল, 'একটা অনুরোধ করতে পারি?'

'বলুন।'

'খালিদ আংকেল চল্লিশ মিনিট সময় দিয়েছিলেন আমাদের। এই সময়টুকু কী করব, বুঝতে পারছিলাম না আমরা। রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। হঠাৎ লেবুর গন্ধ এলো নাকে, খাঁটি কাগজি লেবু। পাশে তাকিয়ে দেখি, লেবুর শরবত বিক্রি করছে একজন, দশ টাকা গ্লাস। দামে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু তিনি যে বোতল থেকে পানি নিয়ে শরবত বানাচ্ছিলেন, বোতলটার ভেতর সবুজাভ শ্যাওলা পড়ে গেছে। তাছাড়া অনেকগুলো মাছিও ঘিনঘিন করছিল চারপাশে। সেটা দেখেও ভীষণ শরবত খেতে ইচ্ছে করছিল।' সামী সোজা হয়ে বসে বলল, 'না না, আপনি যা ভাবছেন তা না। আমরা নিজেরাই সব কিছু নিয়ে এসেছি।' পাশ থেকে চিনির প্যাকেট, চারটা লেবু নিয়ে তামিয়ার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'যদি একটু পানি মিশিয়ে দিতেন— ।'

স্থির চোখে সামীর দিকে তাকাল তামিয়া। তারপর হাত বাড়িয়ে সেগুলো নিয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেল সে।

খালিদ সুবহান সাহেবকে দেখেই ঝট করে উঠে দাঁড়াল মনন। কপালে হাত দিয়ে সালাম দিতেই তিনি বললেন, 'এখন বাজে ৪টা ৫৬ মিনিট। তোমরা ৬ মিনিট দেরী করে এসেছো। সময়ের মূল্য যারা না দেয়, তাদেরকে আমি খুব অপছন্দ করি।' সামনের সোফায় বসলেন তিনি।

'দুটো কারণে আমাদের দেরী হয়েছে, আংকেল।' সামী লজ্জা পাওয়া চেহারায় বলল, 'আমি কি আপনাকে সেই কারণ দুটি বলতে পারি?'

'তুমি বলতে পারো, কিন্তু সেটা শোনার সময় আমার নেই।' খালিদ সাহেব সোফার হাতলের ওপর হেলান দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, তোমরা বলো তো দেখি — কোন জিনিসটা মানুষের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন?'

'অবশ্যই টাকা।' যুবেল বেশ আত্মবিশ্বাসী হয়ে বলল।

'না, আমার মনে হয় বই পড়া।' প্রদীপ্ত সোজা হয়ে বসে বলল, 'রবি আংকেল তো সারাজীবন বই পড়ে গেছেন।'

'আমার মনে হয় একজন মানুষের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে প্রেম এবং ভালোবাসা।' সামী ওর ছাগলে দাড়িগুলোতে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'মানুষ সব কিছু ছেড়ে বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু প্রেম আর ভালোবাসা ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না।'

সিরিয়াস ভঙ্গিতে কথা বলছে সবাই। চুপিচুপি হঠাৎ পকেট থেকে ১০০০ টাকার একটা নোট বের করে মেঝের ওপর ফেলে দেন খালিদ সুবহান সাহেব। তিনি এমনভাবে ফেলে দেন, যদি সামনের চারজনের কেউ দেখেই ফেলে, তারা যেন মনে করে অসাবধানতাবশত পড়ে গেছে নোটটা। সামী দেখে ফেলল দৃশ্যটা এবং টেরও পেল ব্যাপারটা। কারণ নোটটা একটু উড়ে এসে তার কাছে এসে পড়েছে, সোফাসেটের পায়ের কাছে এসে থেমেছে। শরীর ঝুঁকাতে হবে না, কেবল হাতটা নিচু করলেই নোটটা ছোঁয়া যাবে, তুলে আনা যাবে অনায়াসেই।

খালিদ সুবহান সাহেব মুখটা হাসি হাসি করে সামীর বিপরীতে বসা মননের দিকে তাকালেন, 'তুমি?'

মনন আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলল, 'সরি আংকেল, মানুষের আসলে কোন জিনিসটা বেশি প্রয়োজন—এ মুহূর্তে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

খালিদ সুবহান সাহেব এদিকে ফিরে তাকানোর আগেই সামী ১০০০ টাকার নোটটা ঝট করে তুলে নিল, আর পকেট থেকে বের করা ৫০০ টাকার নোটটা রেখে দিল সেখানে।

'একজন মানুষের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে তার মনুষ্যত্ব আর মানবতা।' বিশাল একটা বাণী দিতে পেরেছেন ভেবে দু কান পর্যন্ত হেসে ফেললেন খালিদ সাহেব। কিন্তু মেঝের দিকে তাকিয়েই চমকে ওঠেন তিনি। ১০০০ টাকার নোটটা নেই, ৫০০ টাকার একটা নোট পড়ে আছে সেখানে! কিন্তু চমকানোটা বুঝতে দিলেন না তাদের। মনন খুক করে একটু কেশে বলল, 'আংকেল, তিনদিন না খেয়ে থাকার পর যে লোকটা ভাতের চাল চুরি করে, সেই মুহূর্তে তার কি প্রয়োজন চাল, না মনুষ্যত্ব?'

খালিদ সুবহান সাহেব উত্তর দেওয়ার আগে আড়চোখে মেঝেতে তাকালেন আবার। চমকে উঠলেন আবারও। ৫০০ টাকা নোটের কাছে এখন ১০০ টাকার নোট পড়ে আছে। ঝট করে দাঁড়ালেন তিনি, 'আচ্ছা, তোমরা একটু বসো, আমি একটু ভেতর থেকে আসি।'

খালিদ সাহেব ভেতরের দিকে এগিয়ে যেতেই প্রদীপ্ত ডাক দেয় পেছন থেকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘুরে দাঁড়ান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে চোখ যায় তার মেঝের দিকে। ১০০ টাকার জায়গায় ওখানে এখন ৫০ টাকার একটা নোট পড়ে আছে, বাতাসে একটু একটু কাঁপছে নোটটা!

ড্রইংরুম থেকে রান্না ঘরে এসেই খালিদ সাহেব মেয়েকে দেখে বললেন, 'মা রে, এবার আর ঠেকানো গেল না, অমি বোধহয় এবার সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছি!' তামিয়ার হাতে কী যেন মাখানো। পাশে দাঁড়ানো অর্নাকে দেখে বললেন, 'মা, তুই আমার মাথায় একটু হাত দিয়ে দেখ তো, আগুন বের হচ্ছে না ওখান দিয়ে?'

খালিদ সুবহান সাহেবের মাথায় হাত দিয়ে অর্না বলল, 'না চাচ্চু, একদম ঠিক আছে।'

ট্যাপের পানিতে হাত ধুয়ে তামিয়া বলল, 'তুমি আবার হঠাৎ এ কথা বলছ কেন আব্বু!'

খালিদ সাহেব কাঁপা কাঁপা গলায় কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা বলে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে তামিয়া বলল, 'বাবা, তুমি হয়তো ভুল দেখেছ?'

'মানুষ এক জিনিস কয়বার ভুল দেখে, তুই বল?' রাগতে নিয়েই হেসে ফেলছেন খালিদ সাহেব, 'মেঝের ওপর ১০০০ টাকার নোটটা রাখার কিছুক্ষণ পর তাকিয়ে দেখি ওটা নেই, সেখানে ৫০০ টাকার একটা নোট পড়ে আছে। তারও কিছুক্ষণ পর আবার তাকিয়ে দেখি সেই ৫০০ টাকার নোটটাও নেই, সেখানে ১০০ টাকার একটা নোট পড়ে আছে। এখানে আসার আগে দেখি, ওখানে ৫০ টাকার একটা নোটা পড়ে আছে! হিহি হাহা হিহি হাহা...।' খালিদ সাহেব চেহারা বিকৃত করে বলেন, 'আমার এখন হাসতে হাসতে নাচতে ইচ্ছে করছে, নাচতে নাচতে হাসতে ইচ্ছে করছে।'

তামিয়া গলাটা গম্ভীর করে বলল, 'টাকাটা মেঝেতে ফেলেছিলে কেন?'

'ওদের একটু পরীক্ষা করতে চাচ্ছিলাম। ওই সেদিন একটা ইংরেজি সিনেমা দেখলাম না। কয়েকটা ছেলে চাকরির জন্য ইন্টারভ্যু দিতে এসেছে একটা অফিসে। বসে আছে সবাই ওয়েটিংরুমে। এরই মধ্যে তাদের অনেকেই দেখল তাদের পায়ের কাছে ডলারের নোট পড়ে আছে। ওদিকে অফিসের বস গোপন ক্যামেরায় তার রুমে বসে ব্যাপারটা দেখছেন কম্পিউটারে। তিনি তার অফিসে লোক নিয়োগ দেওয়ার আগে প্রত্যেকের সততা পরীক্ষা করছিলেন।'

'আপনিও কি বাসা ভাড়া দেয়ার আগে ছেলেগুলোর সততা পরীক্ষা করছিলেন চাচ্চু?' অর্না আগ্রহ নিয়ে বলল।

'হ্যাঁ মা।'

'তা কী বুঝলে?' তামিয়া বলল।

'কই, কিছু তো বুঝতে পারলাম না। বরং মাথাটা আরো আওলা করে নিয়ে আসলাম।' খালিদ সাহেবের চেহারাটা রাগে ভরা, কিন্তু হাসার চেষ্টা করছেন তিনি।

'কাজটা তোমার ঠিক হয়নি, বাবা। ছেলেগুলোকে কিন্তু আমার বেশ ভদ্র মনেই হয়েছে।' দু হাতে দুটো প্লেট নিয়ে তামিয়া বলল, 'বাবা তুমি বেডরুমে যাও, আমি ছেলেগুলোর সঙ্গে একটু কথা বলে আসি। অর্না— ।' অর্নার দিকে তাকিয়ে তামিয়া বলল, 'ট্রেতে করে শরবতের গ্লাসগুলো নিয়ে আয় তো তুই।'

খালিদ সুবহান সাহেব কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বলতে পারলেন না। রান্নাঘর থেকে বের হয়ে গেছে মেয়ে দুটো।

তামিয়া ড্রইংরুমে ঢুকে ছোট টেবিলটার ওপর হাতের প্লেট দুটো রাখল। তারপর অর্নার হাত থেকে ট্রেটা নিয়ে পাশেই রাখতে রাখতে বলল, 'আপনাদের মধ্যে কি কেউ জাদু দেখাতে পারেন?'

দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে সামী বলল, 'জাদু দেখাতে পারি না, তবে দেখি, খুব আনন্দ নিয়ে দেখি।'

'কোন জাদুকর আপনাদের সবচেয়ে ফেভারিট?'

'দেশে জুয়েল আইচ, বিদেশে ডেভিড কপারফিল্ড।'

কথা বলতে বলতে তামিয়া মেঝের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে সামীর পায়ের কাছে পড়ে থাকা টাকার নোটটা চোখে পড়ল তার। না, ৫০ টাকার নোট না, ১০০০ টাকার নোটই পড়ে আছে সেখানে।

সামনের ছোট টেবিলটার ওপর রাখা খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে মনন বলল, 'একটা সত্যি কথা বলি আপনাকে। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল আমাদের। কিন্তু আশপাশে কোনো ভালো হোটেল না পেয়ে বুদ্ধিটা যুবেল দিয়েছিল। শুধু শরবত তো আর কারো সামনে দেওয়া যায় না, সঙ্গে একটা কিছু তো অবশ্যই দেয়া হবে। ওর বুদ্ধিটা কাজে লেগেছে।'

তামিয়া খুব নরম গলায় বলল, 'যুবেল কে?'

মনন সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'আর আমি হচ্ছি মনন। আপনি— ।'

'আমি তামিয়া, আর— ।' অর্নার দিকে তাকাল তামিয়া, 'ও হচ্ছে অর্না। আমার কাজিন।'

মনন মুচকি মুচকি হেসে বলল, 'খাবারের গন্ধে পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠছে। কিন্তু আপনাদের মতো এরকম দুজন রূপবতীর সামনে বসে কোনো কিছু মুখে দেওয়া এবং সেগুলো আবার চাবানোটা ভীষণ অস্বস্তিকর! তাই— ।' মনন একটু থেমে বলল, 'আংকেলকে একটু পাঠিয়ে দেবেন?'

শব্দ করে হাসতে হাসতে খালিদ সাহেব ড্রইংরুমে ঢুকে বললেন, 'ডান, যাও বাসাটা ভাড়া দিয়ে দিলাম তোমাদের। সকলে যা ভাড়া দেয়, তোমরাও তাই দেবে। তা তোমরা এই চারজনই থাকবে তো?'

'না, আরো একজন আছে।'

'কী নাম ওর?'

'সাদিদ।'

'ওকে, পাঁচজনই অ্যালাও করলাম।'

খালিদ সুবহান সাহেবের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে সামী বলল, 'আংকেল, আপনি সত্যি একজন মহান্তঃকরণ।'

ঝট করে মাথাটা ঘুরে ওঠে খালিদ সাহেবের। মহান্তঃকরণ শব্দটার মানে তো জানা হয় নাই। সত্যি সত্যি বাজে কোনো শব্দ না তো এটা? ভাবতে ভাবতেই অতি সাবধানে চোখ মেলেন তিনি মেঝেতে। মাথাটা আরো জোরে ঘুরে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে—১০০০ টাকার নোটটা সটান হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে, বাতাসে এ নোটটাও একটু একটু কাঁপছে!

খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাতেন সরকারের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন খালিদ সুবহান। দরজায় টোকা দিতে নিয়েই থেমে গেলেন তিনি। পাশের কলিংবেলে চাপ দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু দরজা খুললেন না বাতেন সরকার। আরো একবার চাপ দিলেন। এবারও খুললেন না। অস্থির হয়ে গেলেন খালিদ সাহেব। পায়চারি করতে লাগলেন দরজার সামনে। কয়েকবার পায়চারি করার পর তিনি আবার স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। কলিংবেলে চাপ দিতে নিয়েই কী মনে দরজায় টোকা দিলেন। এক টোকাতেই খুলে গেল দরজা। বাইরে খালিদ সাহেবকে দেখে বাতেন সাহেব চমকে উঠে বললেন, 'কী সর্বনাশ, ভাই সাহেব, আপনি এখানে!'

'সারা রাত এক ফোঁটা ঘুমাতে পারিনি।'

'কেন!'

'জটিল একটা সমস্যায় পড়েছি।'

'আসুন আসুন, ভেতরে আসুন আগে।' দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে বাতেন সরকার বললেন, 'অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন নাকি, ভাই সাহেব?'

'ঠিক অনেকক্ষণ না।' ঘরের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে খালিদ সাহেব বললেন, 'বেশ কয়েকবার কলিংবেল চেপেছি আপনার।'

'ওটা তো নষ্ট। নতুন একটা লাগাব লাগাব করে আর লাগানো হয়নি।' বাতেন সাহেব একটা চেয়ার টেনে এনে খালিদ সাহেবের সামনে দিয়ে বললেন, 'বসুন। আপনি আসবেন কল্পনারও করেনি আমি।'

'আপনার বাসায় তো ফার্নিচার-টার্নিচার দেখছি না।'

'ফার্নিচার দিয়ে কী করব আমি! একা মানুষ, যা আছে তা-ই তো বেশি।' টুলের মতো একটা জিনিস এনে খালিদ সাহেবের সামনে এসে

বসলেন বাতেন সাহেব, 'ঘরে বেশি জিনিস থাকা মানে বেশি ঝামেলা। ছেলেটা সেনেগালে থাকে, ওর মাকেও নিয়ে গেছে। আমাকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিল, দেশের মাটি ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করেনি। মাসে মাসে যা টাকা পাঠায় তা দিয়ে চলে যায়, যেটুকু বাঁচে তা তো আপনার কাছে জমিয়ে রাখি।'

'আপনার কিন্তু চল্লিশ হাজার টাকার ওপরে জমেছে।'

'তাও জমেছে। আমার কাছে থাকলে এতদিন ভ্যানিশ হয়ে যেত। আগে উপার্জন করতাম অনেক, খরচও করতাম দু'হাত ভরে। এখন তেমন উপার্জন নেই, কিন্তু খরচের হাতটা রয়ে গেছে সেই আগের মতোই। সত্যি কথা বলতে কী ভাই সাহেব, ওই টাকা যদি আমি ব্যাংকেও জমাতাম, তবুও এতদিন তুলে খরচ করে ফেলতাম।' বাতেন সরকার একটু ইতস্তত ভঙ্গিতে বললেন, 'একটু চায়ের ব্যবস্থা করি, ভাই সাহেব।'

'চা পরে খাওয়া যাবে। আগে সমস্যার কথা বলি আপনাকে। পাঁচটা ছেলে আমার একতলার ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছে।'

'পাঁচজন না তো, চারটা ছেলে। আমার সঙ্গে কথা হয়েছে।'

'না, পাঁচজনই। একজনকে আপনি সম্ভবত দেখেননি। অবশ্য আমিও দেখিনি।' খালিদ সাহেব ফিসফিস করার মতো করে বললেন, 'ওই চারজনের একজন আমাকে বলেছে, আমি নাকি মহাঅন্তঃকরণ। আচ্ছা বলেন তো, এই মহাঅন্তঃকরণ মানেটা কি?'

'কী বললেন! মহান্ত — ।'

'না না মহান্ত না, মহাঅন্তঃকরণ।'

বাতেন সাহেব লজ্জা-মাখা একটা হাসি দিয়ে বললেন, 'ভাই সাহেব, জীবনে এই প্রথম এই শব্দটা শুনলাম। আল্লায় জানে এটার মানে কী?'

'সারারাত এটা নিয়ে ভেবেছি। কী যে একটা টেনশনের মধ্যে আছি না!'

'আচ্ছা, আপনার ছেলে-মেয়ে দুজনই তো খুব শিক্ষিত, ওদের জিজ্ঞেস করলে হতো না?' বাতেন সরকার বুদ্ধি দেওয়ার মতো করে বললেন।

'ওদের বলা কি ঠিক হবে?'

'কেন ঠিক হবে না!'

'যদি শব্দটার খারাপ মানে হয়!' খালিদ সুবহান সাহেব বাতেন সরকারের দিকে একটু ঝুঁকে বসে বললেন, 'এই যেমন ধরেন গাধা, আহম্মক, লুটেরা, দুশ্চরিত্র, ভূমিদস্যু, চাপাবাজ!'

'সেটাও একটা প্রশ্ন। বাইরের কিছু ছেলে আপনাকে এসব বলে যাবে, আর আপনি সেটা আপনার ছেলে-মেয়েকে বলবেন, ব্যাপারটা কেমন দেখায় না?' বাতেন সাহেব কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে বললেন, 'আপনি বরং একটা কাজ করুন, চেপে যান ব্যাপারটা। কতজন তো কত কথাই বলে!'

'আমি অবশ্য এটা একবার ভেবেছি। কিন্তু মাথার ভেতর সেই যে কাল থেকে শব্দটা ঢুকেছে এখন পর্যন্ত বের হওয়ার নাম নেই। বের হবে কি, আমি নিজেই বের হতে দিলে তো!' খালিদ সাহেব নিজের মাথায় নিজেই ছোট্ট একটা চাটি মেরে বললেন, 'খুঁতখুঁতে স্বভাবের মানুষদের এই একটা সমস্যা। বুকের ভেতর খুঁতখুঁত করে তাদের, মাথার ভেতর খুঁতখুঁত করে, চোখের ভেতর খুঁতখুঁত করে, সারা শরীরে খুঁতখুঁত করে তাদের।'

'আপনার স্ত্রী তো শিক্ষক মানুষ ছিলেন, তাকে এবার জিজ্ঞেস করুন না।'

'করব?'

'ভাই সাহেব, স্ত্রীর কাছে লুকানোর মতো কিছু আছে কি আমাদের! আপনি বরং এখনই বাসায় যান। তারপর ভাবী সাহেবার মেজাজ-মর্জি বুঝে টুক করে বলে ফেলুন কথাটা।' ভালো একটা উপদেশ দেওয়ার মতো হেসে উঠলেন বাতেন সরকার। কিন্তু খালিদ সাহেবের কোনো হাসি আসছে না। তার মনে হচ্ছে, কারো গালে এখন ইচ্ছেমতো কিছুক্ষণ থাপড়াতে পারলে ভালো লাগত, মেজাজটা ঠাণ্ডা হতো। কিন্তু সেইরকম গালওয়ালা কোনো মানুষ চোখে ভেসে উঠছে না এ মুহূর্তে। রাগে তিনি নিজের গাল দুটো হাতাতে লাগলেন হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে।

নাতাশা মুমতাজ বিরক্ত চোখে সুমীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সকাল সকাল তুই এভাবে সেজেছিস কেন!'

'সাজনের কই দেখলেন, মামী! মুখে তো শুধু একটু পাউডার দিয়েছি—মে তো স্রেফ পাউডার লাগা লিয়া হে।' খুব স্বাভাবিক গলায় বলল সুমী।

'কপালে তো একটা লাল টকটকে টিপও দেখছি।' নাতাশা মুমতাজ একটু ভালো করে তাকালেন সুমীর দিকে, 'কানের দুল জোড়াও তো নতুন। কবে কিনেছিস এটা?'

'এই তো কয়েকদিন আগে।'

'ঠোঁট দুটোও লিপিস্টিক দিয়ে চ্যাটচ্যাট করে ফেলেছিস! সকাল সকাল এরকম সাজ দেখলে ভালো লাগে!'

'কুচ কারণ নেহি—ভালো না লাগার তো কোনো কারণ নাই মামী। হিন্দী সিরিয়ালের সবাই তো সেই সকাল থেকেই একেবারে বিয়ার সাজন দিয়া ঘুম থেকে ওঠে। বাড়ির শাশুড়ি, বউ, ননদ তো গলা থেকে পা পর্যন্ত গয়না-গাটি দিয়ে সাজায়ই, কাজের মেয়েগুলাও ওই একই কাজ করে। কিন্তু আমি ভেবে পাই না, কাজের মেয়ে এত গয়না-গাটি কই পায়, প্রতিদিন নতুন নতুন জামা-কাপড় কই পায়! আর বাড়ির ভেতর সবার এভাবে সেজেগুজে থাকার কারণই বা কী?' সুমী একটু হেসে বলে, 'তবে ব্যাপারটা খারাপ লাগে না, ভালো লাগে। সেজে-গুজে থাকার মধ্যে একটা আনন্দ আছে, ফুর্তিও আছে।' সুমী গলার স্বরটা একটু নিচু করে বলল, 'মামী, মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানেন, আমার যদি এ দেশে জন্ম না হয়ে ওই দেশে হতো! মে বড় খুশরাহু—আমি বড় খুশি হতাম!'

'তুই এসব কী আজেবাজে হিন্দী বলছিস!'

'কেন, ভালো লাগে না আপনার!' সুমী হাসতে হাসতে বলল, 'হিন্দী ভাষা তো বহুত আচ্ছা ভাষা, মামী। আমার তো খুব ভালো লাগে। আমি বাংলাও বলতে পারি, হিন্দীও বলতে পারি, ব্যাপারটা কেমন জ্ঞানী জ্ঞানী মনে হয় না। ভালো কথা— ।' সুমী বেশ উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'নতুন একটা সিরিয়াল শুরু হয়েছে কালকে। ওটাতেও একটা কাজের মেয়ে আছে। সিরিয়ালটা শুরুই হয়েছে ওই মেয়েটাকে নিয়ে। মেয়েটা রান্নাঘরে রান্না করে, ওপাশের বিল্ডিংয়ে একটা ছেলে থাকে, ছেলেটা মেয়েটাকে দেখে পছন্দ করে ফেলে। ছেলেটা খুব বড়লোকের ছেলে!' সুমীর আগের চেয়ে উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি দুজনের মাঝে পেয়ার হবে, কিন্তু শেষপর্যন্ত কী হবে সেটা বুঝতে পারছি না! ব্যাপারটা ভাবতেই গা শিউরে উঠছে আমার। আমি তো— ।'

কথা শেষ করতে পারল না সুমী। তার আগেই খালিদ সুবহান সাহেব কিছুটা হন্তদন্ত হয়ে রান্নাঘরে ঢুকে বললেন, 'সব কাজ বন্ধ। তোমরা দুজন এখন আমার দিকে তাকাও।'

নাতাশা মুমতাজ কী একটা কাজ করছিলেন, তিনি সেটা করতে করতেই বললেন, 'কাজ বন্ধ করতে হবে না, আপনার যা বলার আপনি বলে ফেলুন।'

'তুমি ঘুরে না দাঁড়ালে বলা যাবে না।'

ঘুরে দাঁড়ালেন না নাতাশা মুমতাজ। আগের মতোই কাজ করতে করতে বললেন, 'কান খোলা আছে আমার, আপনি বলুন।'

'একটা মানে খুঁজে পাচ্ছি না। আচ্ছা বলো তো দেখি, মহাঅন্তঃকরণ মানে কি?' খালিদ সাহেব খুব আগ্রহ নিয়ে তাকান স্ত্রীর দিকে।

নাতাশা মুমতাজ এবার ঘুরে দাঁড়ান, 'সেটা আবার কি?'

চেহারাটা রাগী রাগী হয়ে যায় খালিদ সুবহান সাহেবের, সঙ্গে সঙ্গে হাসি হাসি করে ফেলেন মুখটা, 'সেটা তো আমিও জানি না ফারুবের মা। আচ্ছা, বাসায় কি কোনো বাংলা ডিকশনারী আছে?

'না, নেই।'

খালিদ সাহেব চেহারা গম্ভীর করে বলেন, 'তা থাকবে কেন? তোমরা বাজারে গিয়ে তো শুধু কেন ঠোঁট পালিশ, চোখ পালিশ, নাক পালিশ। কোথায় জঙ্গলের ছাপ দেওয়া শাড়ি পাওয়া যায়, কোথায় হাতায় ঝুনঝুনি লাগানো ব্লাউজ পাওয়া যায়, কোথায় ঘোড়ার লেজের চুল পাওয়া যায়, তোমরা তো শুধু সেগুলোই কিনে আনো।'

'দেখেন, আপনি এত বিরক্ত করবেন না তো! যান, আপনার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করুন, ওই সংয়ের মানেটা কি?

'কাকে জিজ্ঞাসা করব?' খালিদ সাহেব চেহারাটা রাগী রাগী করে আবার হেসে ফেলে বলেন, 'তোমার ছেলে এখন আর সেই ছেলে নাই। সে এখন বাবুর্চি হয়েছে। তাকে এখন একটা হোটেল দিয়ে দাও, রান্না করে মানুষকে খাওয়াবে আর টাকা কামাই করবে।' খালিদ সাহেব সুমীর দিকে তাকান, 'ওই ছেমরি, তুই জানিস নাকি — মহাঅন্তঃকরণ মানে কী?'

'বাংলা শব্দ তো, তাই বলতে পারব না মামা, কাশ ইয়ে হিন্দী হোতা — হিন্দী হলে চেষ্টা করে দেখতাম।' চোখ দুটো চকচক করে খালিদ সুবহানের দিকে তাকায় সুমী।

ঘড়ির দিকে তাকাল অর্না — চল্লিশ মিনিটের বেশি হয়ে গেছে কানের সঙ্গে মোবাইলটা ঠেসে ধরে আছে তামিয়া। সেই যে কথা শুরু করেছে, থামার নাম নেই। এই চল্লিশ মিনিটে সে কম করে হলেও তিন ডজন আই লাভ ইউ বলেছে আর শব্দ করে হেসে উঠেছে আরো কয়েক ডজন।

দু হাঁটু উঁচু করে, সেখানে থুতনি ঠেকিয়ে, চুপচাপ বসে আছে অর্না বিছানায়। পাশে তামিয়া। কথা বলতে বলতে সে মাঝে মাঝে অর্নার দিকে তাকায়, চোখ দিয়ে ইশারা করে, ভ্রু নাচায়, অর্না মুচকি হেসে জবাব দেয় তার। কিন্তু বুকের ভেতরটা চিনচিন করতে থাকে তার, পোড়ায়ও। ভালোবাসার প্রকাশটা সবার প্রায় একই—উচ্ছল, প্রাণবন্ত, আনন্দদায়ক।

তামিয়া একটা হাত রাখল অর্নার কাঁধে, আরেক হাতে যথারীতি মোবাইল। চোখ দুটো বুজে ফেলল অর্না সঙ্গে সঙ্গে—ওই তো সবুজ ঘাস দেখা যাচ্ছে, পাশ দিয়ে রাস্তা, গা ঘেঁষে হাঁটাহাঁটি! জীবনের শ্রেষ্ঠতম মুহূর্ত, উড়ে বেড়ানোর সময়, ভেসে বেড়ানোর আকাশ! সোনালী কাব্য লিখে প্রতিদিন, স্বপ্নের বীজ বুনে অঙ্কুরোদমের প্রতীক্ষা, সবশেষে মিষ্টি একটা ঘুম।

চোখ ভিজে উঠেছে অর্নার, ঝাপসা হয়ে যায় দৃষ্টি—প্রতিটা ঘুমই হচ্ছে একটা অনিশ্চিত যাত্রা! কেউ জানে না ঘুম থকে উঠে সে কী দেখবে, ঘুম ভাঙার পর দিনটা তার কেমন যাবে, কী ঘটে যাবে তার সরল জীবনে!

আড়চোখে তামিয়া অর্নার দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল সে। মোবাইলটা রেখে দিয়ে অর্নার মাথাটা নিয়ে জড়িয়ে ধরল নিজের কাঁধের সঙ্গে। আপাতত এটুকুই, এতটুকু করার সামর্থ আছে তার।

বাইরে থেকে দরজায় টোকা দিয়ে খালিদ সুবহান সাহেব বললেন, 'মা তামিয়া, একটু আসব?'

ঝট করে সোজা হয়ে বসল অর্না। তামিয়াও সোজা হয়ে বসে বলল, 'আসো, আব্বু।'

ঘরে ঢুকেই খালিদ সাহেব বললেন, 'সত্যি সত্যি আর ঠেকানো গেল না। আমি এবার পাগল হয়েই যাব।'

'আবার কী হলো তোমার!'

'মারে, বল তো, মহাঅন্তঃকরণ মানে কি?'

'সেটা আবার কী জিনিস, আব্বু?'

'আমিও তো জানি না।'

ফারুবের ঘরে ঢুকতে নিয়েই থমকে দাঁড়ালেন খালিদ সাহেব। নাক কুঁচকে তিনি বললেন, 'ঘরের ভেতর এত পচা পচা গন্ধ কেন!'

খুব নির্ভারভাবে ফারুব উত্তর দিল, 'শুঁটকি মাছের গন্ধ, আব্বু।'

'শুঁটকি মাছ এখানে কেন, শুঁটকি মাছ তো থাকবে রান্নাঘরে!'

'রান্নাঘরেই ছিল। মা এখন রান্না করবে বলে বেডরুমে নিয়ে এসেছি।'

'কী হবে এগুলো দিয়ে?'

'তুমি তো জানো শুঁটকি মাছের পুষ্টি গুণ অনেক বেশি। কিন্তু এই পুষ্টিটা আরো বাড়ানো যায়।'

'কীভাবে?'

'কাজ শুরু করেছি আমি। দেখি, কতদূর সফল হতে পারি।' ফারুব বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি তো শুঁটকি মাছ খুব পছন্দ করো।'

'তা করি।' খালিদ সাহেব কপাল কুঁচকে বললেন, 'কিন্তু নিজেকেই এখন আমার শুঁটকি মাছ মনে হচ্ছে!'

'কেন!'

কোনো উত্তর পায় না ফারুব। হাতের শুঁটকি মাছটা পাশে রেখে ঘুরে তাকিয়ে দেখে, ঘর থেকে বের হয়ে গেছেন খালিদ সাহেব।।

খালিদ সুবহান সাহেব টের পেলেন, কপালের দু দিকে, কানের দু পাশে, অপেক্ষাকৃত নরম জায়গাটায় দপদপ করছে, একটু একটু লাফাচ্ছেও। চেপেও আসছে দু দিকটা। ড্রইংরুমে গিয়ে সোফায় বসে হাসার চেষ্টা করলেন। এরকম মুহূর্তে হাসতে বলেছে ডাক্তার। কিন্তু কোনোভাবেই হাসি আসছে না তার। পকেট থেকে মোবাইলটা বের করলেন তিনি। নাম্বার টেপার পর ওপাশে রিসিভ হতেই তিনি বললেন, 'ডাক্তার, আমার জীবন থেকে হাসি শেষ হয়ে গেছে। এবার বলো তো, মহাঅন্তঃকরণ মানেটা কী?'

'স্যরি, কী বললেন, বুঝতে পারলাম না।' ডাক্তার শাহরিয়ার আবদুল্লাহ দুঃখী দুঃখী গলায় বললেন।

'তোমার কাছে একটা শব্দের মানে জানতে চাচ্ছি।' খালিদ সুবহান সাহেব শ্লো মোশনের মতো বললেন, 'শব্দটা হচ্ছে মহা-অন্তঃ-করণ।'

'মহান— ।'

'মহান না, মহা।' ডাক্তার শাহরিয়ার আবদুল্লাহকে থামিয়ে দিলেন খালিদ সাহেব, 'বুঝতে পেরেছি ডাক্তার। তোমরা কঠিন কঠিন অসুখের মানে বোঝো কিন্তু বাংলা শব্দের মানে বোঝো না!'

মোবাইলটা কেটে দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন খালিদ সাহেব। সঙ্গে নাতাশা মুমতাজ, সুমী, তামিয়া, অর্না, ফারুব দৌড়ে এলো ড্রইংরুমে। এসে দেখে, দাঁত খিঁচিয়ে নিজের মাথার চুল টেনে টেনে তুলছেন খালিদ সাহেব।

নাতাশা মুমতাজ এগিয়ে যেতে নিতেই থমকে দাঁড়ান। কলিংবেল বাজছে। দ্রুত দরজা খুলে দেখেন একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। হাসিহাসি চেহারা করে ছেলেটা বলল, 'আমি সাদিদ। আমরা বন্ধুরা মিলে আপনাদের নিচের তলাটা ভাড়া নিয়েছি। ওরা বিকেলে আসবে, কিন্তু ঘর গুছানোর দায়িত্বটা আমার ওপর পড়ায় আমাকে এই সকালেই আসতে হলো।' সাদিদ নাতাশা মুমতাজের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইয়ে আন্টি, চাবিটা... ।'

চাবি আনার জন্য ভেতরের দিকে যাচ্ছিলেন নাতাশা মুমতাজ। কিন্তু হাত দিয়ে ইশারা করে তাকে থামিয়ে দিলেন খালিদ সাহেব। তারপর সাদিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই ছেলে, ভেতরে আসো।'

ভেতরে এলো সাদিদ। একটা সোফা দেখিয়ে খালিদ সাহেব বললেন, 'ওটাতে বসো।' সাদিদ কিছুটা ইতস্তত ভঙ্গিতে বসতেই তিনি বললেন, 'কী পড়া হয়?'

'সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং।'

'লেখাপড়া শেষ?'

'না, আরো এক বছর লাগবে।'

'বাবা কী করেন?'

'শিপিং বিজনেস।'

'মা?'

'বাবাকে সাহায্য করেন।'

'মফস্বলের মতো এই জায়গাটায় হঠাৎ থাকতে এসেছো কেন তোমরা?' একটু সোজা হয়ে বসে বললেন খালিদ সাহেব।

'আমরা পাঁচ বন্ধুই মাস ছয়েক পর বিদেশ চলে যাচ্ছি, আরো হাইয়ার এডুকেশনের জন্য। আমাদের হঠাৎ মনে হলো, এতগুলো বছর কেটে গেল, আমাদের দেশটাই ভালো করে দেখা হয়নি আমাদের। আমরা প্রজাপতি দেখতে এসেছি, বাবুই পাখির বাসা দেখতে এসেছি, নীল ফুটে থাকা

ঘাসফুল দেখতে এসেছি, নদীর জলে মাছের সাঁতার কাটার দেখতে এসেছি, লাউয়ের মাচায় ঝুলে থাকা লাউ দেখতে এসেছি, সরষে ফুলের হলুদ রং দেখতে এসেছি, বট গাছের ছায়া দেখতে এসেছি, খুব সকালে ঘরের জানালায় বসা দোয়েলের গান শুনতে এসেছি, রাতে ডোবার ব্যাঙের কোরাস শুনতে এসেছি। আংকেল জানেন— ।' সাদিদ একটু থেমে বলে, 'ঘাসের চাদরে শুয়ে রাতের আকাশ দেখার মজাটাই নাকি আলাদা! ঘাসে শুইয়ে থেকে নির্ঘুম নক্ষত্র দেখতে এসেছি চুপচাপ।'

'ব্ল্যাকহোলের ব্যাপারটা বোঝো তো তুমি?'

'জি, বুঝি।'

'সাগরের পানি লোনা কেন এটা জানো তো?'

'জানি।'

'চাঁদ আর সূর্যের সম্পর্ক?'

'এটাও জানি।'

'এবার বলো তো দেখি— ।' খালিদ সাহেব ছোট্ট করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'মহাঅন্তঃকরণ মানে কী?'

হেসে ফেলল তামিয়া, পাশে দাঁড়ানো অর্নাও। ফারুব আর নাতাশা মুমতাজ দাঁড়িয়ে আছেন চুপচাপ। ব্যাপারটা খেয়াল করল সাদিদ। একপলক ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মহাঅন্তঃকরণ মানে হচ্ছে—মহৎ, মহান, উদারহৃদয়, মহানুভব, মহামনা, মহাশয়, মহাত্মা—আরো বলব?'

মুখটা হাসি হাসি হয়ে গেছে খালিদ সাহেবের, 'না, মানেগুলো আবার বলো তো তুমি?

'মহৎ, মহান, উদারহৃদয়, মহানুভব, মহামনা, মহাশয়, মহাত্মা।'

হাসিতে ভরে গেছে খালিদ সাহেবের চেহারা। সাদিদের দিকে তাকিয়ে বলেলেন, 'অতি উত্তম মানে, তাই না?'

'জি।' সাদিদ উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে খালিদ সাহেব বললেন, 'কোথায় যাচ্ছো তুমি! আরে, বসো। সকালে নাস্তা করা হয়নি আমার। একসঙ্গে নাস্তা করব আমরা। মাথার ভেতর জট পেকে ছিল, জটটা ছেড়ে গেছে, আহ্ আরাম! ভালো কথা— । খালিদ সাহেব সাদিদের দিকে একটু ঝুঁকে বসে বললেন, 'তুমি আমার বাসায় সকাল বিকাল দুবেলা আসবে। চা খাব, আড্ডা দেব। বুদ্ধিমান একটা ছেলের সঙ্গে কথা বলাও আনন্দের।'

'আন্টি— ।' সাদিদ নাতাশা মুমতাজের দিকে তাকাল, 'আম্মু আসতে চেয়েছিলেন আমার রুমটা সাজিয়ে দিতে, কিন্তু নতুন একটা শিপ কেনার ঝামেলায় আসতে পারবেন না। আপনার কাছে হাতুড়ি আছে?'

'হাতুড়ি দিয়ে তুমি কী করবে?' খালিদ সাহেব বললেন।

'পুরনো জাহাজের কিছু জিনিস এনেছি আমি। কিন্তু কোথায় কোথায় যে লাগাব, সম্ভবত বুঝতে পারব না সেটা।' সাদিদ ইতস্তত ভঙ্গিতে বলল, 'আমিও ওসব বুঝি না, বাবা। অর্না তো ইন্টেরিওয়র ডিজাইনে পড়ে, ও ভালো বোঝে।' নাতাশা মুমতাজ রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বলেন, 'তার আগে নাস্তাটা সেরে নাও।' হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, 'কী যেন নাম বললে তোমার? সাদিদ?'

কানের সঙ্গে মোবাইলটা ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সাদিদ। কথা বলছে না কোনো। আরো কিছুক্ষণ এভাবে থাকার পর লম্বা একটা শ্বাস ছেড়ে সে বলল, 'তুমি কি আমার বুকের শব্দ শুনতে পাচ্ছো, মামনি?'

মিষ্টি করে হাসলেন কান্তা তাজিন। ছেলের কথার সরাসরি জবাব না দিয়ে তিনি বললেন, 'দুটো কারণে বুকে শব্দ হয়। এক. অপরাধ করলে, দুই. ভালোবাসাবাসিতে পড়লে। তোমার ক্ষেত্রে কোনটা ঘটেছে, সাদ?'

'দুটোই।' খুব দুঃখী দুঃখী গলায় বলল সাদিদ।

'আমি তো জানি দুটো না, একটা। অপরাধ স্বীকার করলে সেটা আর অপরাধ থাকে না, সাদ।' কান্তা তাজিন একটু শব্দ করে হেসে বলেন, 'কিন্তু কতজন মানুষ আছে এ সমাজে, যারা অপরাধ ঘটিয়ে তা স্বীকার করে, করতে চায়? অথচ তুমি চেয়েছে!'

'মামনি, তোমার মনে আছে— ।' সাদিদ মোবাইলটা অন্যপাশে এনে বলল, 'ছোটবেলায় অনেক দুষ্টু ছিলাম আমি। আশপাশের অনেকেই তোমার কাছে কমপ্লিন নিয়ে আসত। আমার দোষ থাকুক অথবা না থাকুক, তুমি সবার কাছে আমাকে স্যরি বলিয়ে নিতে।'

'তুমি কিন্তু বলতে চাইতে না।'

'সেটা তো প্রথম প্রথম, মামনি। তারপর কেউ কমপ্লিন নিয়ে আসলে তুমি বলার আগেই আমি স্যরি বলতাম।' সাদিদ একটু থেমে বলল, 'স্যরি বলাটা অনেক কঠিন কাজ, মামনি।'

'তবুও বলতে হয়।'

'মামনি— ।' কথা শেষ করে না সাদিদ, থেমে যায় ও।

কান্তা তাজিন নরম গলায় বলেন, 'বলো।'

'খুব বেশি অপরাধ করে ফেলেছি আমি, না?'

'তোমার রিয়ালাইজেশন কী বলে?'

'অপরাধটা খুব বেশি হয়ে গেছে, মামনি! না হলে বুকের ভেতর এতো পোড়াবে কেন, ঘুমাতে পারি না কেন আগের মতো, হাসতে পারি না কেন শব্দ করে, স্বাদ পাই না কেন কোনো খাবারে!'

'তুমি কি জানো নিজেকে অপরাধী ভাবাটাই হচ্ছে অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রথম ধাপ।' কান্তা তাজিন একটু হেসে বলেন, 'তোমাকে সাপোর্ট করছি না, তবু বলছি—তুমি যা করেছ তা প্রায় প্রতিদিন কোথাও না কোথাও ঘটছে। কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে, কেউ এটা স্বীকার করে না, তুমি করেছ! এসব ক্ষেত্রে তোমার বাবার মতোই সরল হয়েছ তুমি। ভুল তো মানুষই করে। তুমি কি জানো, প্রতিটা ভুল হচ্ছে একেকটা শিক্ষা। যারা বুদ্ধিমান, তারা নেয় শিক্ষা, অন্যরা সেই ভুলগুলো বারবার করতে থাকে।'

সাদিদ একটু চুপ হয়ে থেকে বলল, 'বাবার ভুলটা কি খুব বেশি ছিল, মামনি?'

'ভুল ভুলই। কিন্তু সেটা বড় না ছোট সেটা নির্ভর করে তার দ্বারা মানবতার কত ক্ষতি হলো, মনুষ্যত্ব কতটুকু ক্ষয়ে গেল।'

'বাবাকে তুমি ক্ষমা করে দিয়েছিলে তো!'

'খুব ভালো একটা কথা মনে করেছ তুমি।' কান্তা তাজিন একটু উচ্ছল হয়ে বলেন, 'একটা ভুল তখনই সংশোধন হয়ে যায়, ভুল দ্বারা আক্রান্ত মানুষটা যদি ক্ষমা করে দেয়। ভুল কিংবা অপরাধ স্বীকার মতো ক্ষমা করতে পারাটাও খুব কঠিন কাজ, সাদ।'

'খুব কঠিন কাজ, মামনি।'

'খুব কঠিন।'

'তাহলে!'

চোখে জল এসে গেল কান্তা তাজিনের। কিন্তু বুঝতে দিলেন না তা ছেলেকে। গলাটা ভারী হয়ে আসছে তার। গত কয়েক মাস ছেলেটা কেমন চুপ হয়ে গেছে। ভালো করে খায়নি, রাতে ঘুমায়নি। হাসিটাও উধাও হয়ে গেছে তার মুখ থেকে। একদিন কৌশলে সব জেনে নেন তিনি ছেলের কাছ থেকে। মাথাটা ঘুরে যায় তার। তিনি বুঝতে পারেন, ছেলের অপরাধবোধটা কাজে লাগাতে হবে, এটা কাজে লাগিয়েই তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে হবে।

'তুমি চেষ্টা করে যাও, সাদ।'

সাদিদ আবার চুপ হয়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণ পর আবার দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'বাবুনকে কি কিছু জানে মামনি?'

'তোমার কি মনে হয় তোমার বাবাকে কিছু জানানো উচিত?'

'আমি সেটা বুঝতে পারছি না, মামনি।'

'ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও তাহলে।'

'ওকে।' সাদিদ একটু ইতস্তত ভঙ্গিতে বলল, 'বাবুন যদি ব্যাপারটা জেনে যায়, লজ্জায় আমি মরে যাব, মামনি।'

'আমার ছেলেকে আমি কখনো লজ্জায় ফেলব না, স্যোয়ার। সো রিল্যাক্স।' কান্তা তাজিন একটু ভেবে বলেন, 'বন্ধু বেছে নেওয়ার ব্যাপারে তোমার আরো সাবধান হওয়া উচিত। সামী, যুবেল, প্রদীপ্ত, মনন— তোমার এই বন্ধুগুলো আমার বেশ পছন্দের। সম্ভবত ওরা একটু অন্যরকম। ভালো কথা, যে বাসাটা ভাড়া নিয়েছ পছন্দ হয়েছে সেটা?'

'খুব।'

'তোমার বাথটাব নেই, হাই কমোড নেই, এগ সেপড বেসিন নেই, তবুও খুব পছন্দ হয়েছে!'

'ওগুলো না থাক, কিন্তু অন্যরকম একটা জিনিস আছে, মামনি।' সাদিদ বেশ উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'আমার রুমের ভেন্টিলেটরে চড়ুইয়ের একটা বাসা আছে, সম্ভবত বাচ্চা ফুটেছে সেটাতে, শব্দ পাওয়া যায় সেগুলোর। একটু পরপরই দুটো চড়ুই খাবার নিয়ে আসে মুখে করে, টুক করে ঢুকে যায় ভেন্টিলেটরের ফাঁকে, তারপর আবার বের হয়ে যায় জানালা দিয়ে। অদ্ভুত, মামনি!' গলাটা হঠাৎ ভারী করে ফেলে সাদিদ, 'মামনি, আমি তো এখন আর তোমার সেই গুড বয়টি নেই, তুমি তো আমাকে আর আগের মতো ভালোবাসবে না, না!'

ল্যাপটপের চার্জারটা ফিট করতে নিতেই শব্দ হলো দরজায়। পাশে রেখে দিয়ে দ্রুত এসে দরজা খুলে দিল সাদিদ। তামিয়া আর অর্না দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। তামিয়া ওর হাতের কফির মগটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনার জন্য, আম্মু পাঠিয়েছেন।'

মগটা হাতে নিয়ে সাদিদ বলল, 'থ্যাংকস।'

'ওটা আম্মুকে দেবেন।' ঘরের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে তামিয়া বলল, 'আমাদের বাসায় কেউ কফি খায় না। সবাই চায়ে অভ্যাস্ত। কিন্তু আপনার পছন্দ কফি। নাস্তা করার সময় সেটা জানতে পেরে আম্মু আব্বুকে বলেছেন, আব্বু কোনোরকম ইতস্তত না করে দোকানে গিয়ে কিনে এনেছেন। আমরা যদি হঠাৎ এরকম কিছু খেতে চেতাম, যেটা বাসায় নেই, আব্বুকে অন্তত দশবার অনুরোধ করতে হতো।'

সাদিদ হাসতে হাসতে বলল, 'স্যরি।'

'স্যরি হওয়ারও কিছু নেই। আমার আব্বু এরকমই, বাসায় একবার ঢুকলে আর বেরই হতে চান না। অথচ এই বছর দুয়েক আগে যখন অফিস করতেন, অফিস থেকে বাসায় ফেরার সময় কিছু না কিছু আনতেনই। প্রতিদিন। হোক তা পেয়ারা, আমড়া, চিনে বাদাম, পপকর্ন, হওয়াই মিঠাই, যখন সামনে যা পেতেন তাই নিয়ে আসতেন। আমার মনে পড়ে না, আব্বুকে কোনোদিন খালি হাতে বাসায় ঢুকতে দেখেছি।'

'এরকম একটা বাবা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।'

'একদম ঠিক। ভালো কথা— ।' হাতের মোবাইলটার দিকে তাকিয়ে তামিয়া বলল, 'আমি কিন্তু ডিবেট করি। মোটামুটি ভালো কথা বলতে পারি. সম্ভবত একটু বেশিও বলি। সো, স্যরি। আপনার ঘর গুছানোতে সাহায্য করার জন্য মা পাঠিয়েছেন অর্নাকে, আমি আসতে চাইনি, কিছুটা জোর করে আমাকেও পাঠিয়েছেন। এসে অবশ্য ভালোই হয়েছে। আপনারা দুজন মুক্ত মনে ঘর গোছাতে থাকুন। আর আমি ওই কোনার ঘরে গিয়ে মুক্ত মনে ফোনে কথা বলতে থাকি। বাসায় কথা বলা বেশ দুর্যোগপূর্ণ।'

'কী পূর্ণ!' কফিতে চুমক দিতে নিয়েই থেমে গেল সাদিদ।

'দুর্যোগপূর্ণ। সবাই, বিশেষ করে আম্মু এমন করে তাকায় যেন আমি আমাদের সংসারের যাবতীয় গোপন কথা অন্যকে বলে দিচ্ছি মোবাইলে।'

'ফোনে কার সঙ্গে কথা বলবেন?'

পাঁচ ফুট এগার ইঞ্চি সাদিদের দিকে একটু এগিয়ে আসে পাঁচ ফুট দু ইঞ্চির তামিয়া। মাথা উঁচু করে তার দিকে তাকায়, চোখ দুটো সরু করে, 'আপনার বয়স কত?'

'২২ ডিসেম্বর জন্ম।'

'সাল?'

'সেটা আপনি ইচ্ছেমতো বসিয়ে নিন, সমস্যা নেই আমার।'

চোখ দুটো আরো সরু করে তামিয়া, 'বুঝেছি, বারো কি তের!'

'মামনি বলেন আরো কম!'

'ওকে, এত কম বয়েসি বাচ্চার শুনে কাজ নেই, আমি কার সঙ্গে কথা বলব। ওকে, আপনারা স্টার্ট করুন।' পাশের ঘরটার দিকে তাকিয়ে তামিয়া বলল, 'আমিও স্টার্ট করি।'

কফিতে শেষ চুমকটা দিয়ে সাদিদ বলল, 'আপনাকে কী বলে ডাকব, ম্যাডাম, মিস, না— ।'

'ম্যাডাম, মিস, ওসব কিছু না, অর্না।'

'অর্না— ।' মেঝের ওপর মগটা রেখে সাদিদ বলল, 'আপনারা এখানে আসার আধাঘণ্টা আগ থেকে একটা জিনিস আমি সেট করতে চাচ্ছি, কিন্তু পারছি না।'

'কোন জিনিসটা?' বেশ আগ্রহ নিয়ে বলল অর্না।

মেঝে থেকে একটা মুখোশ হাতে নিল সাদিদ, 'এটা।'

সাদিদের হাত থেকে মুখোশটা নিয়ে অর্না রুমের চারপাশটা দেখল একবার। তারপর বাম পাশের দেয়ালটা দেখিয়ে বলল, 'ওটার ঠিক মাঝখানে লাগালে ভালো লাগবে। কারণ দেয়ালের ওই ওপরের লাইটা জ্বালালে রাতে একটা শেড পড়বে দেয়ালের চারপাশে। মেঝেতেও কিছুটা পড়বে। একটা ভৌতিক ভৌতিক ভাব আসবে।' অর্না ম্লান হেসে বলল, 'ভয় পাবেন না তো আবার? অনেকেই তো বেশ ভূতের ভয় যায়!'

'ভূত হলে ভয় পাব, তবে পেত্নি হলে কাছে ডেকে গল্প করব।'

'গল্প করতে ভালো লাগে আপনার?'

'অনেক অনেক। সবকিছু নিয়ে গল্প করতে ইচ্ছে করে আমার। পাখি নিয়ে গল্প, ফুল নিয়ে গল্প, চাঁদ নিয়ে গল্প, আকাশ নিয়ে গল্প, মানুষ নিয়ে গল্প, মানুষের আনন্দ নিয়ে গল্প, কষ্ট নিয়ে গল্প, প্রত্যাখ্যাত হওয়ার গল্প, প্রতারিত হওয়ার গল্প, প্রেমের গল্প, প্রেম-ভাঙার গল্প, স্বপ্ন আর স্বপ্ন ফুরিয়ে যাওয়ার গল্প, মানুষ দ্বারা নষ্ট হওয়ার গল্প, ইয়ে— ।' মাথা নিচু করে ফেলেছে অর্না, সাদিদ একটু এগিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, মুখোশটা ওই দেয়ালে লাগালে ভালো লাগবে। কিন্তু ওই ক্যান্ডেল-টিউবটা?'

'ওটা তো শিপের, না?'

'হ্যাঁ, আম্মু এনে দিয়েছেন।'

'খুব সুন্দর।'

'আপনার পছন্দ হয়েছে?'

'পছন্দ হওয়ার মতোই তো!' অর্না পাশের জানালার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'এটা ঠিক আপনি জানালার মাঝখানে লাগাতে পারেন। তবে সম্পূর্ণ টিউবটা ঝুলে থাকবে নিচে, যাতে ঘরের বাইরে থেকে পুরোটা দেখা যায়। যখন কারেন্ট থাকবে না, কিংবা ঘরের লাইট অফ করে, ওই টিউবটাতে একটা ক্যান্ডেল জ্বালিয়ে দেবেন, সারা ঘরে আলো-আঁধারী খেলা করবে।'

'আলো-আঁধারীর ব্যাপারটাই কিন্তু অদ্ভুত!'

'রহস্যময়ও।'

'মানুষের মনের চেয়েও, হৃদয়বৃত্তির চেয়েও?'

মাথাটা আবার নিচু করে ফেলেছে অর্না। সাদিদ মেঝেতে আবার নিচু হয়ে ছোট্ট একটা টব হাতে নেয়। অর্নার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'একটা ক্যাকটাস।' সাদিদ একটু থেমে বলে, 'ক্যাকটাস আপনার কেমন লাগে?'

'অদ্ভুত।'

'যদি একটা রুমের সমস্ত কিছু শুধু ক্যাকটাস দিয়ে সাজানো হয়, তাহলে কেমন লাগবে বলুন তো?'

'ও রকম একটা রুম দেখার সঙ্গে সঙ্গে পাগল হয়ে যাব আমি, স্রেফ পাগল হয়ে যাব। চোখ বুজে থাকব আমি, চুপচাপ। মৃত্যু এসে ছুঁয়ে না দেওয়া পর্যন্ত ওভাবেই থাকব।'

অর্নার হাত থেকে ছোট্ট টবটা আবার হাতে নেয় সাদিদ, 'ভালোবাসা হচ্ছে টবে রাখা এরকম গাছের মতো—রোদে ভেজাতে হয়, মাঝে মাঝে পানিতেও। ছুঁয়েও দেখতে হয় কখনো কখনো। নিষ্ঠা নিয়ে এক পরম পরিচর্যা। তবেই সে প্রস্ফুটিত, সুবাসিত, আর বর্ণিল।'

চোখ মেলে এই প্রথম অর্না সাদিদের দিকে তাকাল। সাদিদ আলতো ভাবে ঘুরে দাঁড়াল, যেন সে কিছুই টের পায়নি। ক্যাকটাসের টবটা জানালার নিচের দিকে দেয়ালের ওপর রেখে বলল, 'একটা প্রশ্ন করি?'

অর্না হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল। পাথরের মতো কিছুটা শক্তও দেখাচ্ছে তাকে। বিব্রত ভঙ্গিতে একবার তাকিয়ে মাথাটা নিচু করে ফেলতেই সাদিদ বলল, 'খুব সাধারণ একটা প্রশ্ন। না না, আপনি সংকোচ করলে করব না। যদিও প্রশ্নটাতে সংকোচের কিছু নেই।'

মাথাটা আবার উঁচু করল অর্না, 'বলুন।'

'একজন মানুষের জীবনে কতবার ভালোবাসা আসতে পারে?' সাদিদ অর্নার চোখের দিকে তাকাল। অর্না একপলক তাকিয়েও রইল। জানালার দিকে এগিয়ে গিয়ে দু হাতে গ্রিলটা চেপে ধরল শেষে সাদিদ, 'অনেকবার, মৃত্যু কাছে না আসা পর্যন্ত। যাদের জীবনে ভালোবাসা থাকে না, তারা প্রাণহীন মানুষ, উপরে ফেলা গাছের মতো।' সাদিদ ঘুরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'বাংলা সিনেমা না দেখলে যা আমরা কখনো জানতামই না, বলুন তো কী জানতাম না?'

'বলতে পারছি না।' অর্না সামান্য হেসে বলল।

'অনেক কিছু জানতাম না।'

'যেমন?' বেশ আগ্রহী দেখাচ্ছে অর্নাকে।

'যেমন প্রচণ্ড মার খাওয়ার পরও নায়কের শরীর-চেহারায় কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যাবে না। কিন্তু নায়িকা যখন তার মুখে বা শরীরের কোথাও সহানুভূতির হাত ছোঁয়াবে তখনই সে উহ্ করে উঠবে এবং চোখ-মুখ বিকৃত করে ফেলবে। আবার ভিলেন নায়িকাকে দৌড়ানি দিল, নায়িকা বালুময় রাস্তার ভেতর গড়াগড়ি খেল বেশ কিছুক্ষণ, কিংবা ঝুম বৃষ্টির মধ্যে হাত-পা লাফালাফি করে নায়িকা কয়েক ঘণ্টা ভিজল, তবুও তার ঠোঁটের লিপস্টিক একটুও মুছবে না, এমনকি লেপটাবেও না। কী ঠিক?'

অর্না হেসে বলল, 'ঠিক।'

'আমি আরো কিছু বলি, আপনি শুনে যান।' সাদিদ মেঝেতে বসতে বসতে বলল, 'বসুন না।' অর্না বসতেই সে বলল, 'নায়ক গরিব হলে নায়িকা ধনী হবে, আবার নায়িকা গরিব হলে নায়ক ধনী হবে। এবং একসময় তাদের মাঝে প্রেম হবে, জটিলতা সৃষ্টি হবে। তারপর ধনীজন তার পরিবার ছেড়ে গরিবজনের হাত ধরে খালি হাতে চলে আসবে। শুরু হবে সংগ্রাম। কিন্তু দিন-সপ্তাহ-মাস কেটে গেলেও ধনীজনের চেহারা থাকবে আগের মতোই — চকচকে, ঝকঝকে। দামী দামী পোশাকও দেখা যাবে তার গায়ে, এমনকি পায়ে নতুন জুতোও।' সাদিদ একটু থেমে বলল, 'বাংলা সিনেমায় মা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। মায়ের যদি রক্তের দরকার হয় তাহলে কোনোরকম রক্ত পরীক্ষা ছাড়াই, গ্রুপ মেলানো ছাড়াই নায়ক রক্ত দিয়ে থাকে। আবার নায়কের রক্তের দরকার হলে নায়কের মা দিয়ে থাকে। যেন দুনিয়ার সবার গায়ের রক্ত এক, এক গ্রুপের।' সাদিদ

হাসতে হাসতে বলে, 'পাগলও একটা ইম্পর্ট্যান্ট চরিত্র। সিনেমার ভেতর পাগল হয়ে কেউ ট্রাফিক কন্ট্রোল করছে, কেউবা চিৎকার করে ভাষণ দিচ্ছে, কেউ কেউ আবার হু হু করে কাঁদছে। কোনো চিকিৎসাই ভালো করতে পারছে না তাদের। হঠাৎ মাথায় আঘাত পেল তারা, কিংবা সিঁড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল তাদের, সঙ্গে সঙ্গে তারা ভালো হয়ে যায়, সুস্থ হয়ে যায় সম্পূর্ণ।'

আগের চেয়ে একটু বেশি হেসে উঠল অর্না, 'টেলিভিশনে মাঝে মাঝে বাংলা সিনেমা চোখে পড়ে। তখন এরকম দৃশ্য দেখেছি আমি।'

'তাই।' সাদিদ অর্নার দিকে একটু ভালো করে খেয়াল করল। অর্না ব্যাপারটা টের পেতেই দ্রুত সাদিদ বলল, 'দেখুন তো, এ দৃশ্যগুলো দেখেছেন কিনা। যদি সিনেমার প্রথমেই কোনো জন্মদিনের দৃশ্য থাকে তাহলে একটা গান থাকবে, সবাই সেই গান নেচে নেচে গাইবে। তারপরের দৃশ্য হবে খুনের দৃশ্য। সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। শেষে বড় হয়ে ওই গানের সূত্রেই সবার পরিচয় হবে। আবার যদি কোনো জমজ ভাই থাকে, তাহলে তাদের একজন হবে ফেরেশতার মতো, অপরজন হবে ইবলিশের মতো। কী ঠিক?'

উৎফুল্ল হয়ে অর্না বলল, 'অবশ্যই ঠিক।'

'নায়ক যখন দশ বারোজনের সঙ্গে মারামারি করে তখন সেই দশ বারোজন একসঙ্গে আসে না। একজন একজন করে নায়কের সামনে আসে। মার খেয়ে একজন পড়ে যাবার পর আরেকজন আসে। আবার নায়ককে মারার জন্য যেখানে একটা গুলি করাই যথেষ্ট, ভিলেন সেখানে অদ্ভুত কিছু যন্ত্র নিয়ে নায়ককে মারার চেষ্টা করে। হয়তো সেটা ফুটন্ত গরম পানির চৌবাচ্চা, আগুনের চুল্লি, বৈদ্যুতিক করাত ইত্যাদি। কিন্তু নায়কের কিছুই হচ্ছে না। কিন্তু নায়ক একাই সবাইকে মেরে শেষ করে ফেলছে।'

'ইয়েস।' ব্যাটসম্যানকে বোল্ড আউট করে বোলার যেভাবে হাত নাচায়, সেভাবে হাত নাচিয়ে অর্না বলল, 'প্রতিটি সিনেমাতেই এটা একটা কমন দৃশ্য। খুবই হাস্যকর। আমি তো— ।' অর্না কথা বলতে নিয়েই থেমে যায়। ও ঘর থেকে তামিয়া এসে দাঁড়িয়েছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সে তার দিকে। বুকের ভেতর অদ্ভুত একটা আনন্দ-ঘণ্টা বেজে ওঠে তামিয়ার। ঠোঁটের কোনা দুটো হেসে উঠতে নিয়েই থেমে যায় সে। নিজেকে আপাতত সামলে রাখে সে। দ্রুত সাদিদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'মোবাইলের চার্জ ফুরিয়ে গেছে, চার্জার আছে নাকি আপনার কাছে?'

'মোবাইলটা দেখি আপনার?' তামিয়া মোবাইল দেখাল। সঙ্গে সঙ্গে সাদিদ বলল, 'হ্যাঁ, ওই তো আছে।' মেঝের কোনার দিকে তাকাল সাদিদ। তামিয়া সেদিকে গিয়ে চার্জারটা হাতে নিয়ে বলল, 'চার্জে দিয়ে কথা বলব। আপনাদের ঘর সাজানোর খবর কি? আরো কিছুক্ষণ কথা বললে অসুবিধা নেই তো?'

তামিয়া আবার পাশের ঘরে চলে গেল। সাদিদ একটু সোজা হয়ে বসে বলল, 'খারাপ লাগছে না তো আপনার?'

'না।'

'এতো ছোট করে বললেন!'

'ভালো লাগছে। অনেকদিন পর— ।' অর্না থেমে যায়, কিছু বলে না। সাদিদও না। অর্নার দিকে তাকিয়ে থেকে সময় দেয় তাকে একটু। মাথা নিচু করে আছে সে। হঠাৎ উঁচু করে বলল, 'বাংলা সিনেমার সব ঘটনা বলা শেষ আপনার?'

'না, আরো একটা বলি।' সাদিদ হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'প্রচণ্ড মারামারি হচ্ছে। সবাই মরে ফিনিস। কেবল নায়ক আর ভিলেন বেঁচে আছে। দুজন মারামারি করতে করতে কুকুরের জিভের মতো জিভ ঝুলিয়ে ফেলেছে, হাঁপাচ্ছে। ওই অবস্থায় নায়ক একটা পাথর উঁচু করে, কিংবা ছুরি দিয়ে অথবা পিস্তল দিয়ে ভিলেনকে যেই না মারতে যাবে, তখনই পুলিশ এসে উপস্থিত হবে। চিৎকার করে বড় পুলিশটি বলবেন, 'খবরদার, আইন নিজের তুলে নেবেন না!'

মুগ্ধ চোখে অর্না একপলক সাদিদের দিকে তাকাল। সাদিদ সেই মুগ্ধতার জবাব দিয়ে বলল, 'সবুজ ঘেরা এসব এলাকার বিকেলটা কিন্তু অন্যরকম। কোনো উঁচু জায়গা, আই মিন ছাদে উঁঠে সেই বিকেল দেখার আনন্দটাই কিন্তু আলাদা।' সাদিদ পলকহীন চোখে অর্নার দিকে তাকাল, 'আপনার কী মনে হয়?'

কোনো জবাব দিল না অর্না, শুধু এক টুকরো হাসি ঝুলিয়ে রাখল ঠোঁটের কোনায়।

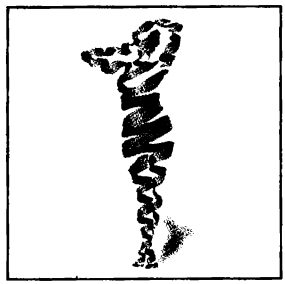

ফারুব হন্তদন্ত হয়ে রান্নাঘরে ঢুকে বলল, 'আম্মু, একটা কাজ করেছি আমি, তুমি কিন্তু রাগ করতে পারবে না!'

সবজি কাটছিলেন নাতাশা মুমতাজ। সেগুলো পাশে রেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোর কি মনে হয়, আমি সব সময় রাগ করি?'

'ঠিক তা না, তবে আমি যেটা করেছি সেটা শুনে রেগে যেতে পারো তুমি।' মায়ের আরো একটু কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ফারুব বলল, 'বলো তো, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য কোনটি?'

'পৃথিবীতে সুন্দর দৃশ্য তো একটা না, অনেকগুলো।'

'সেগুলোর মধ্যে একটা দৃশ্য সবচেয়ে বেশি সুন্দর।'

নাতাশা মুমতাজ আবার সবজি হাতে নিলেন। কিছুটা অপারগতার ভঙ্গিতে বললেন, 'বলতে পারব না।'

'সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য হচ্ছে মানুষের খাবার খাওয়ার দৃশ্য।' ফারুব মায়ের ঠিক পেছনে গিয়ে দাঁড়াল, 'একজন ক্ষুধার্ত মানুষ এত নিমগ্ন হয়ে খাবার খায়, একজন অতি ধর্মভীরুও এত মনোযোগ দিয়ে স্রষ্টার প্রার্থনা করে না; একজন ক্ষুধার্ত মানুষ এত আনন্দ নিয়ে খাবার খায়, রাজ্য জয়েও কাউকে এমন আনন্দিত দেখায় না; একজন ক্ষুধার্ত মানুষ এত ভক্তি নিয়ে খাবার হাতে নেয়, চরম পরাক্রমশালীকেও কেউ এরকম ভক্তি করে না। এবার তুমিই বলো, এমন ক্ষুধার্ত যখন খাবার মুখে দেয়, তখনকার দৃশ্যটা পৃথিবীর সেরা দৃশ্য না! শ্রেষ্ঠ দৃশ্য না। সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য না!'

সবজি থেকে আবার ঘুরে দাঁড়ান নাতাশা মুমতাজ। মুগ্ধ চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'একজন ক্ষুধার্ত মানুষ এত ভালোবাসা নিয়ে খাবারের দিকে তাকায়, কেউ তার প্রিয়জনের দিকেও এত ভালোবাসা নিয়ে তাকায় না।' নাতাশা মুমতাজ চোখ দুটো ছলছল করে বলেন, 'আমি কি একটা স্যরি বলতে পারি তোকে?'

'কেন!' ভ্রু কুঁচকে ফেলে ফারুব।

নাতাশা মুমতাজ লাজুক হাসিতে বলেন, 'আমি ভাবতাম, আমার ছেলেটা খুব ভালো স্টুডেন্ট, কিন্তু তার বোধ একটু কম। এখন দেখি, না, আমারই বোধ কম। না হলে তার সম্বন্ধে এ ভাবনাটা আসবে কেন আমার!' নাতাশা মুমতাজ আগের চেয়ে লাজুক হাসেন, 'স্যরি, বাবা।'

'আব্বু কি বাজারে গেছে, আম্মু?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'তাহলে আমাকে আবার বাজারে যেতে হবে।'

'কোনো সমস্যা?'

'না, পৃথিবীর সুন্দরতম কিছু দৃশ্য দেখব আজ।' ফারুব খুব কাতর গলায় বলল, 'আমাদের এলাকার যে দুজন নাইটগার্ড আছেন না, তারা একেকজন বেতন পান চার হাজার তিনশ টাকা। তাদের একজনের তিন সন্তান, একজনের দু সন্তান। একজনের বাবা-মাও আছেন। সেই নাইটগার্ডের একজন গত আড়াই বছরে একটা ইলিশ মাছ কিনে নিতে পারেননি তার বাসায়, আরেকজনের বাসায় পোলাও রান্না হয়নি গত দুই বছর। আম্মু— ।' ফারুব মায়ের একেবারে সোজাসুজি দাঁড়ায়, 'সুলতান চাচা আছেন না?'

'কোন সুলতান চাচা?'

'ওই যে মেহরাবদের পাশের বাসার সুলতান চাচা। রিটায়ার্ড করার পর যে টাকা পেয়েছিলেন তার সব দিয়ে ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়েছেন। ছেলে বিদেশে গিয়ে টাকা পাঠানো দূরের কথা, ভুলে গেছে বাবা-মা দুজনকেই। সুলতান চাচা তো প্রায়ই আমাদের বাসার সামনে দিয়ে কোথাও না কোথাও যায়, তাকে দেখে কি মনে হয়, কোনো কোনো দিন সম্পূর্ণ না খেয়ে থাকেন তিনি। যে মানুষটি মাঝেই মাঝেই না খেয়ে থাকেন, চিকন চালের ভাত আর গরম গরুর মাংসের কথা তিনি তো কল্পনাও করতে পারেন না কখনো। তাই না, আম্মু?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানান নাতাশা মুমতাজ। সম্ভবত গলা বুজে এসেছে তার। চোখ দুটো তো ছলছল হয়েই আছে। ফারুব মায়ের কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'রাস্তার ওপাশের সুফিয়া দাদুর চারটা ছেলে। অথচ মহিলা একটু খাবারের জন্য এ দুয়ারে ও দুয়ারে ঘুরে বেড়ান

প্রতিদিন। ছেলেগুলো পর হয়ে গেছে। এক থাল টাঙ্গাইলের মিষ্টি আর এক হাঁড়ি বগুড়ার দই ওনার সামনে দিলে কেমন হয়?'

'খুব ভালো হয়।' ছলছল চোখেই হেসে ওঠেন নাতাশা মুমতাজ।

'তারা সবাই আজ আমাদের বাসায় খাবেন।' ফারুব কিছুটা শংকিত গলায় বলল, 'রাতেই।'

নাতাশা মুমতাজ গভীর চোখে ছেলের দিকে তাকালেন। চোখ দুটো হাসছে এখন তার। কোনো কিছু না বলে কিছুটা চঞ্চল পায়ে দ্রুত বের হয়ে গেলেন রান্নাঘর থেকে। তার চেয়েও দ্রুত আবার ফিরে এসে ফারুবের হাতে বেশ কিছু টাকা দিয়ে বললেন, 'তোর যা মনে চায়, কিনে আন। পৃথিবীর সুন্দরতম দৃশ্য দেখতে আমারও ইচ্ছে করছে।'

টাকাগুলো হাতে নিতেই নাতাশা মুমতাজ আবার সবজির দিকে তাকালেন। ফারুব কিছুটা ধীর পায়ে এগিয়ে গেল মায়ের দিকে। তারপর ইতস্তত স্বরে বলল, 'সম্ভবত বোধহীন একটা কাজ করেছি আমি, আম্মু।' নাতাশা মুমতাজ চোখ দুটো একটু বড় করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাকে আশ্বস্ত করার ঢংয়ে পিঠে হাত রাখে সে, 'কথাটা অন্য একদিন বলব তোমাকে।'

বাজারের ব্যাগটা হাতে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন খালিদ সুবহান সাহেব। ব্যাগের ওপর দিয়ে বড় একটা লেজ দেখা যাচ্ছে মাছের। কিছুটা ঠাস করে ব্যাগটা মেঝেতে রাখতেই নাতাশা মুমতাজ বললেন, 'আবার কী হলো!'

খালিদ সুবহান সাহেব সুমীর দিকে তাকালেন, 'এক গ্লাস পানি দে।'

'জরুর — অবশ্যই।' রান্নাঘরের তাক থেকে সবচেয়ে বড় মগটা হাতে নিয়ে ডায়নিংরুমে গেল সুমী। পানি নিয়ে ফিরে আসতেই ঢকঢক সবগুলো পানি খেলেন খালিদ সুবহান সাহেব। গ্লাসটা ফেরত দিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কপাল থেকে মাছ সব উঠে যাচ্ছে।'

নাতাশা মুমতাজ কাজ করতে করতেই বললেন, 'কেন?'

'আমার বাবার অবস্থা খুব ভালো ছিল না। গ্রামের মানুষ, অবস্থা আর কত ভালো হবে! তবুও মাসে একবার বাড়িতে পাঙ্গাস মাছ নিয়ে আসতেন তিনি। পুরোটা তো আনার সামর্থ্য ছিল না, সেরখানেক আনতেন। তখন কিন্তু কেজি ছিল না, সের ছিল।' খালিদ সুবহান সাহেব একটু থেমে বলেন, 'আমি চল্লিশ বছর আগের কথা বলছি। ওই সময়ে এক সের মাছের দাম কত ছিল, জানো তুমি?'

ঘুরে দাঁড়ালেন না নাতাশা মুমতাজ। আগের মতোই কাজ করতে করতে বললেন, 'কত?'

'আড়াইশ টাকা। নদীর খাঁটি পাঙ্গাস মাছ ছিল। মুখের কাছে টকটকে লাল ছিল, পেটের কাছটা চওড়া ছিল এক হাত, লেজটাও দেখার মতো ছিল। ছয় ভাই-বোনের সংসার, মা-বাবা, দাদা-দাদী, বিধবা একটা ফুপু, একটা কাজের মেয়ে, এতগুলো মানুষ ওই এক সের মাছের একটু একটু করে পেতাম। ওই ছোট একটা টুকরোতেই পুরো দুই থাল ভাত খাওয়া হয়ে যেত আমাদের। জিভের ওপর মাছের একটা অংশ যখন পড়ত, স্বাদ আর আনন্দে কলজে পর্যন্ত নাচতে থাকত। সেই পাঙ্গাস এখন পুকুরে চাষ হচ্ছে!'

'ওই মাছ এখন বাড়িতে আনা তো দূরের কথা, বাজারে দেখলেই ঘৃণায় বমি আসতে থাকে।' নাতাশা মুমতাজ মুখটা বিকৃত করে বলেন, 'অন্যান্য মাছ তো এখন পাওয়াই যায় না, যা পাওয়া যায় কেনার সামর্থ্য নেই অনেকের। এই মাছগুলো সস্তা, তাই অনেকে কেনে।'

'পাঙ্গাসের পর এসেছে কই মাছ। নদী কিংবা পুকুরে যে কই মাছগুলো আগে পাওয়া যেত, সেই মাছগুলো না খেলেই চলত, শুধু ওই মাছে তরকারি দিয়ে ভাত খাওয়া শেষ করা যেত। এখন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কই মাছ চাষ হয়, অনেক কই মাছ পাওয়া যায় এখন বাজারে, বেশ সস্তা। কিন্তু পাঙ্গাস মাছের মতো এটাও মুখে দেয়া যায় না।' খালিদ সুবহান সাহেব একটু থেমে বলেন, 'খুব খারাপ একটা সংবাদ হচ্ছে, মাছের বাজার থেকে একটু আগে শুনে আসলাম, ইলিশ মাছও নাকি পুকুরে চাষ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। অত্যান্ত স্বাদের এই মাছটা বিস্বাদ হয়ে যাবে, ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এই দেশের সবকিছু নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাছও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! তোমাকে এত কিছু বলার কারণ কী জানো?' খালিদ সুবহান দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'বাজারে ঢোকার আগে বড় একটা হোটেল আছে না?'

'কোন হোটেলটা?'

'ওই যে কী সব চিকেন ফ্রাই-ট্রাই কিনে নিয়ে আসো যে দোকান থেকে!'

'কেন, কী হয়েছে ওই দোকানে?'

'পুলিশ এসে এক বস্তা মরা মুরগি উদ্ধার করেছে ওই দোকান থেকে।'

'মরা মুরগি, না জবাই করা মুরগি?'

'মরা মুরগি। প্রতিদিন সারাদেশ থেকে যে মুরগিগুলো ঢাকায় আসে, তার নয় থেকে তের পার্শেন্ট মুরগি মারা যায়। সেগুলো কিন্তু ফেলে দেওয়া হয় না, সারা ঢাকার বেশ কয়েকটা হোটেলে চলে যায় ওই প্রাণহারা প্রাণীগুলো।'

'কী বলছেন আপনি এসব!'

খালিদ সুবহান সাহেব আর কিছু বলেন না। চুপচাপ উঠে চলে যান বেডরুমে। মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু না, মন খারাপ করা যাবে না। ডাক্তার নিষেধ করেছেন।

ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে তিনি দাঁড়ান। ঠোঁট দুটো একটু একটু ফাঁক হয়ে যাচ্ছে, একটু একটু শব্দ হচ্ছে, শব্দটা বাড়তে বাড়তে এক সময় চিৎকারের মতো শোনায়। নাতাশা মুমতাজ দৌড়ে এসে দেখেন, না, চিৎকার না, খালিদ সুবহান সাহেব হাসছেন, প্রাণ খুলে হাসছেন।

সুমী খুব আনন্দ নিয়ে খালিদ সাহেবের রুমে ঢুকে বলল, 'মামা, চা বানিয়ে দেই এককাপ?' বিছানায় শুয়ে ছিলেন নাতাশা মুমতাজ। তার দিকে তাকিয়েও সে বলল, 'মামী, আপনাকেও এককাপ দেই?'

দুপরে খাওয়ার পর সাধারণত চা খান না তারা। খালিদ সাহেব আড়চোখে একবার স্ত্রীর দিকে তাকালেন। স্ত্রীও তাকিয়ে আছেন তার দিকে, মুখে স্মিত হাসি। খালিদ সাহেব একটু সোজা হয়ে বসে বললেন, 'দিবি? দে।' সুমী চা বানানোর জন্য চলে যাচ্ছিল। খালিদ সাহেব ডেকে ফেরালেন ওকে। তারপর মুচকি হেসে বললেন, 'চা না, কফি এনেছি না, কফি বানিয়ে দে। তোর জন্যও এক কাপ।'

'শুকরিয়া মামা, বহুত শুকরিয়া। শুধু কফি, আউর কুছ?'

খালিদ সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, 'নেহি।'

হাসি হাসি মুখ করে চলে গেলে সুমী। সঙ্গে সঙ্গে খালিদ সাহেব বললেন, 'সুমীর হিন্দী বলা তো আমাদের ওপরও ভর করছে। ভালো কথা— ।' খালিদ সাহেব স্ত্রীর গা ঘেঁষে বসে বললেন, 'আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় কাজটা আমি ভালো করেছি না?'

'কোন কাজটা?'

'এই যে দুপুরে মাছের মাথাটা খেতে দিলাম সুমীকে?'

'খুবই ভালো করেছ।'

'সত্যি বলছো তো?'

'হ্যাঁ। ওদেরও তো মাথা খাওয়ার ইচ্ছে হয়।'

'অথচ দেখ, এই ব্যাপারটা আমরা কেউ ভেবে দেখি না। প্রতিদিন ওরা কষ্ট করে মাছ কাটে, মাছ ধোয়, মাছ রান্না করে, আর বড় বড় টুকরোগুলো খায় অন্যজন। একদিনও ওদের পাতে বড় কোনো মাছের টুকরো যায় না। বড় অন্যায়।' খালিদ সাহেব বেশ উৎফুল্ল হয়ে বলেন, 'তাহলে আমি আজ একটা ভালো কাজ করলাম, না? দাঁড়াও, ব্যাপারটা লিখে রাখি।'

বেডরুমের দেয়ালে লাগানো প্লাস্টিকের বোর্ডটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন খালিদ সুবহান সাহেব। ভালো কোনো কাজ করলে সেটাতে লিখে রাখবেন বলে লাগিয়েছেন তিনি দেয়ালে। পাশে রাখা মোটা কালির কলমটা হাতে নিয়ে তিনি লিখতে লাগলেন, আমাদের কাজের মেয়ে সুমীকে— ।' লেখা বন্ধ করে খালিদ সাহেব ঘুরে নাতাশা মুমতাজের দিকে তাকালেন, 'আচ্ছা, যারা বাসা-বাড়িতে কাজ করে, তাদেরকে আমরা কাজের মেয়ে বলি, কিন্তু সেটা বলা কি ঠিক?'

নাতাশা মুমতাজ কিছুটা অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে না পারার তো কানো কারণ নেই মুমতাজ বেগম। আমিও তো এক সময় চাকরি করতাম, আমারও একজন মালিক ছিল, সুমীরও একজন মালিক আছে। দুজনই কাজই হচ্ছে জীবন চালানোর জন্য কাজ করা। এখন আমার মালিক যদি আমাকে কাজের ছেলের কিংবা কাজের লোক বলত, তাহলে সেটা শুনতে কি আমার ভালো লাগতো! মনে হতো না, মালিকের নাকে জোরছে একটা ঘুষি মেরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে আসি। তোমার কি মনে হয় না, সুমীরও এরকম কিছু একটা করতে ইচ্ছে করে? নাকে ঘুষি মারতে ইচ্ছে না করুক, কিছু দিয়ে পেটাতে ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে। করে না?'

'আমি কি করে বলব!'

'ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করব নাকি?'

'এসব কথা জিজ্ঞেস করা যায় নাকি!' নাতাশা মুমতাজ বিছানা থেকে উঠে সোজা হয়ে বসে বলেন, 'আর জিজ্ঞেসও যদি করা হয়, তাহলে ও

সত্য কথাটা বলবে নাকি! ও কি বলবে, হ্যাঁ, আপনাদের পিটিয়ে পিঠের ছাল তুলে ফেলতে ইচ্ছে করে আমার!'

'সেটাও ঠিক।' খালিদ সুবহান সাহেব আমাদের কাজের মেয়ে এই লেখা টুক করে মুছে ফেলে দিয়ে বলেন, 'ফ্যামিলি হেলপার শব্দটা কেমন বলো তো, নাতাশা?'

'ভালো।' নাতাশা মুমতাজ একটু হেসে বলেন, 'ফ্যামিলিতে আমরা যারা বাস করি, তারা প্রত্যেকেই তো একেকজন ফ্যামিলি হেলপার।'

নাতাশা মুমতাজের দিকে মুগ্ধ চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন খালিদ সাহেব, তারপর নুতনভাবে লিখলেন—আমাদের একজন ফ্যামিলি হেলপার সুমীকে আজ একটা মাছের মাথা খেতে দিয়েছি আমি। লেখাটা শেষ করেই ডাক্তারকে একটা ফোন করলেন তিনি, 'হ্যালো— ।' ওপাশ থেকে ডাক্তার শাহরিয়ার আব্দুল্লাহ সাড়া দিতেই তিনি বললেন, 'ডাক্তার, ভালো কাজ করলে মন ভালো থাকে, এটা তো তুমি জানো। কিন্তু তুমি কি বলতে পারবে, আজ আমি কোন ভালো কাজটা করেছি?'

'কোন ভালো কাজ?'

'তুমি আমাকে প্রশ্ন করছ কেন, ডাক্তার! আমিই তো তোমাকে প্রশ্ন করলাম।' খালিদ সুবহান সাহেব হেসে বললেন, 'তোমাকে বিকেল পর্যন্ত সময় দিলাম, তুমি ভাবো। ভেবে বের করতে পারলে আমাকে জানিয়েও।' তিনি আরো একটু হেসে বললেন, 'না পারলে আমি তো আছিই। কেমন?' মুগ্ধ চোখে দেয়ালে লাগানো বোর্ডটার দিকে তাকালেন খালিদ সাহেব, এখন শুধু চোখ না, সমস্ত শরীর হাসছে তার!

ছাদে পা রেখেই নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলল অর্না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। বিকেলের ঝিরিঝিরি বাতাস বইছে, কিন্তু আশপাশে কেউ নেই। ভালো করে আরো একবার তাকাল, না, সত্যি কেউ নেই। ছোট্ট করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে ছাদের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল, রেলিংয়ে হাত দুটো রেখে চোখ মেলে দিল সামনে, শূন্যে।

ছাদের দরজায় খুট করে একটু শব্দ হলো। ঘুরে তাকাল অর্না। না, কেউ না। বাতাসে অল্প অল্প নড়ছে দরজাটা। সামনে আবার ফিরে তাকাল

সে, বিকেল দেখার সত্যি একটা আনন্দ আছে, এখান থেকে, এই উঁচুতে থেকে, এই নির্জন ছাদ থেকে।

'আরে, তুমি!' দরজা খুলে বাইরে তাকাতেই খালিদ সাহেব সাদিদকে দেখে বললেন, 'ছাদে যাচ্ছিলে নাকি, রাখো তোমার ছাদে যাওয়া। তোমার সঙ্গে জরুরি অনেক কথা আছে আমার। ভেতরে আসো।' খালিদ সাহেব দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজ আমি একটা ভালো কাজ করেছি, সেটা বলব আগে তোমাকে।'

সাদিদ কিছুটা ইতস্তত ভঙ্গিতে ভেতরে এলো। খালিদ সাহেব দরজা বন্ধ করে সোফায় এসে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে কলিংবেলটা বেজে উঠল। দরজার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'সাদিদ, দরজা খুলে দাও তো তুমি, দেখো তো কে এলো। আমি তোমার জন্য এককাপ কফি, আর আমার নিজের জন্য চা নিয়ে আসি। জম্পেশ একটা আড্ডা দেব আজ। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, তোমার সঙ্গে আড্ডাটা জমবে ভালো।'

খালিদ সাহেব ভেতরের ঘরের দিকে যেতেই দরজা খুলে দিল সাদিদ। বাইরে অর্না দাঁড়িয়ে। গলাটা নিচু করে সাদিদ বলল, 'স্যরি।' অর্না মিষ্টি হেসে বলল, 'চাচ্চু, আজ একটা ভালো কাজ করেছেন, বলেছেন তিনি সেটা?' অর্না আরো একটু হেসে বলল, 'নো প্রবলেম, প্রতিটি বিকেলেই অন্যরকম, আনন্দের। সম্ভবত আগামীকালেরটাও তাই হবে!'

বাতেন সরকারের ঘরে ঢুকেই সুমী কিছুটা শব্দ করে বলল, 'মামা, আপনার ঘরের আর জিনিসপত্র কই গেল!'

খুব স্বাভাবিক গলায় বাতেন সরকার বললেন, 'কই— ।' ঘরের চারপাশে একপলক তাকালেন তিনি, 'সব তো ঠিকই আছে ।'

'আপনার ফ্রিজ কই?'

'ও হ্যাঁ, ফ্রিজটা একটু ডিস্টার্ব করছিল, ওই যে কম্প্রেশার আছে না, ফ্রিজের পেছনের দিকে থাকে, শব্দ করছিল ওটা ।' বাতেন সরকার ফ্রিজ রাখার জায়গাটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঠাণ্ডাও হচ্ছিল না তেমন ।'

সুমী একটু এগিয়ে গিয়ে পাশের রুমে উঁকি দিয়ে বলল, 'আপনার টিভিটাও তো দেখছি না!'

'কপাল খারাপ হলে এমনই হয় ।' বাতেন সরকার চেহারাটা বিকৃত করে বললেন, 'ওটাও নষ্ট হয়ে গেছে। ছবি ভালো আসছিল না, সারাক্ষণ ঝিরঝির করে আর লাফায় । কালকে সার্ভিস সেন্টারে দিয়ে এসেছি । এক সপ্তাহের মধ্যে অবশ্য দিয়ে দেবে ।'

'আপনি তো তাহলে অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছেন না ।' সুমী কিছুটা উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'ইদানিং যা সুন্দর সুন্দর হিন্দী সিরিয়াল হচ্ছে!'

'আমার বাসায় তো ডিশের লাইন নেই ।'

'আপনার বাসায় তো খাট, সোফা, ডায়নিং টেবিল, এসবও নেই! ঘরের জিনিসপত্র এত কম!'

'একা মানুষ, বেশি কিছুর দরকার নেই ।' বাতেন সরকার প্রসঙ্গ পাল্টানোর ভঙ্গিতে বললেন, 'চা খাবে, সুমী?'

'ইসকা কোয়ি জরুরত নেহি ।'

'কী বললে!' চমকানোর মতো করে বলেন বাতেন সরকার।

'কোনো প্রয়োজন নেই। সকালে ঘুম থেকে উঠেই এককাপ খেয়ে নিয়েছে।' সুমী বেশ আয়েশী ভঙ্গিতে ঘরের দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে বলল, 'কিন্তু জানেন, আমি কিন্তু আগে চা খেতাম না। ভাতই পেতাম না, আবার চা!'

'হঠাৎ চা খাওয়া শিখলে কোথা থেকে?'

'হিন্দী সিরিয়াল থেকে। ওখানে প্রায় সবাই চা খায়, সুন্দর সুন্দর কাপে চা খায়।' সুমী আগের চেয়ে উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'ওদের চা খাওয়া দেখে মনে হয়, এটা ছাড়া জীবন অচল। আর কিছু না হোক, এটা খেতেই হবে। আপনাকে একটা ঘটনা বলি।' সুমী পাশ থেকে একটা বেতের মোড়া দিয়ে বসতেই আঁৎকে উঠে বলল, 'মামা, আপনার মোড়াও তো যায় যায় অবস্থা। পড়ে তো আমার কোমড় ভেঙে যাচ্ছিল প্রায়।'

ম্লান একটা হাসি দিয়ে বাতেন সরকার বলেন, 'নতুন একটা কিনব কিনব করে আর কেনা হচ্ছে না। শুধু মোড়া না, আরো অনেক কিছু কিনতে হবে। তুমি— ।' প্লাস্টিকের একটা ছোট্ট টুল দেখিয়ে তিনি বললেন, 'তুমি বরং ওটাতে বসো। একটু ময়লা আছে, পরিষ্কার করে নাও।'

সুমী টুলটা টেনে নিয়ে, ওড়না দিয়ে মুছে, বসতে বসতে বলল, 'একটা নুতন সিরিয়াল শুরু হয়েছে তিন চারদিন হলো। খুব বড়লোকের বাসায় একটা কাজের মেয়ে এসেছে। আসলে কিন্তু সে কাজের মেয়ে না।'

'তাহলে কে?'

'ওই বাসাতে ছোট ছেলেটা আছে না, তার ইয়ে— ।' সুমী হাসতে হাসতে বলল, 'পেয়ার-মহব্বত আর কি। এত মজার সিরিয়াল, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়!'

বাতেন সরকার আরো একটু এগিয়ে আসেন সুমীর দিকে। কিছু একটা বলার চেষ্টা করতে নিয়েই থেমে যান তিনি। সুমী ব্যাপারটা টের পেয়ে বলল, 'কিছু বলবেন বোধহয়, মামা?'

'হ্যাঁ, ইয়ে— ।' বাতেন সরকার গোপন কথা বলার মতো গলাটা নিচু করে বললেন, 'তোমাদের বাসায় যে একটা মেয়ে এসেছে, ঘটনা কি বলো তো!'

'কে, অর্না আপু?'

'অর্না না পর্না, নাম তো জানি না।' বাতের সরকার নড়বড়ে মোড়াটা নিয়ে সুমীর সামনে বসে বললেন, 'সারাক্ষণ মুখটা কালো করে রাখে। অথচ কী সুন্দর দেখতে মেয়েটা!'

'কিছুদিন আগে একটা হিন্দী সিরিয়াল শেষ হয়েছে, ওটাতে একটা নায়িকা ছিল, বোবা। অর্না আপু ঠিক তার মতো দেখতে।'

'তুমি কি তার সম্বন্ধে কিছু জানো?'

'তার সম্বন্ধে আর কী জানব!'

'না— ।' বাতেন সরকার বেশ ইতস্তত ভঙ্গিতে বললেন, 'তিন-চার মাস আগে স্থানীয় একটা পত্রিকায় একটা ছবি দেখেছিলাম। কিছুটা তোমাদের ওই মেয়েটার মতো। আমার আবার ভুলও হতে পারে। বুড়ো মানুষ, চোখে তো আর আগের মতো দেখি না।'

'অর্না আপুর ছবি ছাপা হবে কেন পত্রিকায়!'

'ছবিটা যে অর্নার, সেটা কিন্তু আমি বলিনি। ওরকম দেখতে আর কি।' বাতেন সরকার অনুরোধের ভঙ্গিতে বললেন, 'তুমি আবার খালিদ ভাইজানকে কিছু বলো না। কাউকেই কিছু বলার দরকার নেই। তুমি বরং একটা কাজ করে দাও আমাকে।' পকেট থেকে অনেকগুলো দুমড়ানো মুচড়ানো টাকার নোট বের করে তিনি বললেন, 'এগুলো একটু গুনে দাও তো। তুমি বোধহয় জানো, খালিদ ভাইসাহেবের টাকা জমাই আমি। চল্লিশ হাজারের বেশি জমেছে। আজ এগুলোও জমানোর জন্য দেব। ভালো কথা— ।' বাতেন সরকার টাকার নোটগুলো আবার পকেটে ঢুকিয়ে বললেন, 'এত সকালে তুমি হঠাৎ আমার এখানে কেন, সেটাই তো জিজ্ঞেস করা হয়নি।'

প্লাস্টিকের টুল থেকে কিছুটা লাফিয়ে উঠে সুমী বলল, 'মামা আপনাকে ডেকেছে। নতুন যে ছেলেটা এসেছে, তাকেও যেতে বলেছে। পনের-বিশ মিনিটের মধ্যে যেতে বলেছে কিন্তু, জরুরি নাকি!'

সাদিদ ঘুম জড়ানো গলায় বলল, 'মামনি, তুমি তো এত সকালে ফোন দাও না কখনো, কোনো প্রবলেম?'

খুব ভেজা গলায় কান্তা তাজিন বললেন, 'রাতে ভালো ঘুম হয়নি আজ।'

বেশ থমকে গেল সাদিদ, কিন্তু বুঝতে দিল না মাকে। ছোট্ট করে একটু হেসে বলল, 'আমাদের অনেকেরই সকাল দেখা হয় না। অথচ দিনের সবচেয়ে সুন্দর সময় হচ্ছে সকাল।'

'আর সেই সময়টা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেই আমরা।' কান্তা তাজিন কিছুটা উৎফুল্ল হয়ে বলেন, 'আমি কিন্তু এখন তোমার রুমে, তোমার বিছানায়।'

সাদিদ আবার থমকে গেল, এবারও বুঝতে দিল না মাকে। মায়ের উৎফুল্ল গলা শুনে সেও উৎফুল্ল হওয়ার চেষ্টা করল, 'প্রতিটা মানুষের শৈশব হচ্ছে সকাল বেলার মতো—সতেজ, মিষ্টি, অনুভবের।' সাদিদ একটু থেমে বলল, 'মামনি, তুমি কিন্তু আজ একটা কাজ করতে পারো।'

কান্তা তাজিন আগ্রহ নিয়ে বললেন, 'কী কাজ?'

'তোমার কোনো প্রিয় জায়গা থেকে ঘুরে আসতে পারো। কোনো প্রিয় জায়গায় যাওয়া মানে নিজেকে খুঁজে পাওয়া।' সাদিদ একটু থেমে বলল, 'বাবুনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারো।'

'কিন্তু কয়দিন ধরে কেমন যেন মাথাটা তেমন কাজ করছে না আমার।' কান্তা তাজিন অলস ভঙ্গিতে বললেন, 'ঠিক বুঝতে পারছি না, কী করলে ভালো লাগবে, কোথায় গেলে শান্ত লাগবে নিজেকে।'

'বাইরে কোথাও যাবে নাকি?'

'আর কত! সব দেশই তো প্রায় দেখা হয়ে গেছে।'

'তাহলে নানুর বাড়ি থেকে ঘুরে আসো।' সাদিদ আবার হেসে বলল, 'গিয়ে তোমার প্রিয় পুকুরের পাশে বসে থাকো কিছুক্ষণ। নিশ্চিত, মন ভালো হয়ে যাবে তোমার।'

কিছুক্ষণ চুপ হয়ে রইলেন কান্তা তাজিন। তারপর ছোট্ট করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'তোমার কি মনে হচ্ছে আমার মন খারাপ?'

সাদিদও নিঃশ্বাস ছাড়ল, একটু শব্দ করে ছাড়ল, 'শুধু মনে হচ্ছে না মামনি, সম্ভবত জানিও—কেন তোমার মন খারাপ?'

কান্তা তাজিন হঠাৎ আড়মোড়া ভাঙার মতো করে বললেন, 'একটা কথাই তো বলতে ভুলে গেছি তোমাকে—তোমার একটা ক্যাকটাসে ফুল ফুটেছে। কী অদ্ভুত গোলাপি আভার ফুল! হাওয়াই মিঠাইয়ের মতো। ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে!'

'মামনি, এমন হলে কেমন হতো বলো তো— ।' সাদিদ একটু থেমে বলল, 'বছরের শেষ দিনে প্রতিটা পরিবারে একটা করে ফুল ফুটবে, খুব বড় কোনো ফুল না, শাপলার মতো। পরিবারের সবাই একবার করে ছুঁয়ে দেখবে সেই ফুলটা। ছোটখাটো সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে তাদের। কিন্তু ওই পরিবারের সে সদস্যটা নিজেকে সবচেয়ে বেশি দুঃখী মনে করবে, সে ছুঁয়ে থাকবে সারাদিন। দিন শেষে তার আর কোনো দুঃখ থাকবে না!'

'ওরকম ফুল আছে তো?'

'আছে!' সাদিদ শব্দ করে হেসে বলল, 'কোথায়?'

'প্রতিটি মায়ের কাছেই প্রতিটা ছেলে কিংবা মেয়ে হচ্ছে ওরকম ফুল। দিন শেষে তারা যখন বাসায় ফেরে, সন্তানের মুখ দেখে তারা তাদের সারাদিনের সব ক্লান্তি, সব দুঃখ ভুলে যায়।'

'মামনি— ।' সাদিদ একটু সময় নিয়ে বলল, 'আমাকে নিয়ে তুমি খুব কষ্টে আছো, না? তুমি কষ্টে আছো, যখনই আমার এটা মনে হয়, আমি কুঁকড়ে যাই মামনি, আমি শূন্য হয়ে যাই। মানুষ তো ভুল করে মামনি, করুক, কিন্তু আমি কেন করব!'

খালিদ সুবহানের বাসায় ঢুকেই চিৎকারের শব্দ পেল সাদিদ। ভেতরের ঘরে চিৎকার করছেন তিনি। ড্রইংরুমের সোফায় একজন মানুষ বসা, কিন্তু বাতেন সরকারের সঙ্গে তার পরিচয় হয়নি বলে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। খালিদ সাহেব কেন চিৎকার করছেন বুঝতে পারছে না সে, এ মুহূর্তে কী করা উচিত, বুঝতে পারছে না সেটাও।

ফারুব হঠাৎ বাইরের রুমে এসে বলল, 'আব্বুর একটু সমস্যা হয়েছে, আপনারা বসুন। আব্বু আপনাদের চলে যেতে মানা করেছেন।'

বাতেন সরকার সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন, 'ভাইসাহেবের সমস্যা কী?'

'পেটের সমস্যা।' ফারুব আর কিছু না বলে ভেতরের ঘরে চলে গেল আবার। অন্যপাশের সোফায় বসে ড্রইংরুমের ভেতরের দরজার দিকে তাকাতেই চমকে উঠল সাদিদ। পর্দার ফাঁক দিয়ে ওপাশের ঘরটা দেখা যাচ্ছে, ঘরের ভেতরের খাটের একটা অংশও দেখা যাচ্ছে। অর্নাকে দেখা

যাচ্ছে সেখানে, হাঁটুর সঙ্গে কপাল ঠেকিয়ে চুপচাপ বসে আছে সে খাটের ওপর। বিষণ্ন ভঙ্গিতে বসে আছে একা।

ব্যাপারটা ভালো লাগল না সাদিদের। সময়ও কাটতে চাচ্ছে না। পাশের লোকটার সঙ্গে কথা বলা যায়, কিন্তু কথাও বলতে ইচ্ছে করছে না।

দশ-বারো মিনিট পর কোঁকাতে কোঁকাতে ড্রইংরুমে এলেন খালিদ সুবহান সাহেব। একটা সোফায় বসেই হাসার চেষ্টা করলেন, ম্লান হাসি। পেটের ওপর দু হাত চাপা দিয়ে বললেন, 'কাল রাতে আমার গুণধর ছেলে ফারুব নিজে রান্না করেছিল। বেশ কয়েকবজন গরিব মানুষ খাওয়েছে সে। খুবই ভালো কথা। হরেক পদের রান্না। মুরগিও ছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর রাতে যখন ঘুমাতে যাব তখন মনে হলো, পেটের ভেতর কী যেন লাফাচ্ছে।'

বাতেন সরকার প্রচণ্ড উদ্বিগ্নতা নিয়ে বললেন, 'বলেন কী, ভাইসাহেব?'

'শুয়ে ছিলাম, ঝট করে উঠে বসি বিছানায়। লাফানো তবুও থামে না। অস্বস্তিকর এক ব্যাপার!' খালিদ সাহেব পেটে চাপ দিয়ে বলেন, 'আপনার ভাবীকে বলি, দেখো তো পেটের ভেতর কী যেন লাফাচ্ছে। কিছুক্ষণ পেটে হাত দিয়ে থাকার পর সে বলল, কই, কী লাফাচ্ছে! কোনো কিছু লাফানোর তো আভাস দেখছি না। কিন্তু আমার তখন পেটের ভেতর ঝড় বইয়ে যাচ্ছে।'

'এখন কী অবস্থা?' বাতেন সরকার আগের মতোই উদ্বিগ্ন।

'আগের রাতের কথা শেষ করি আগে। শেষে পেটের ভেতর লাফানোটা এমন বেড়ে গেল, আমি আর কুলাতে পারলাম না। বিছানা থেকে নেমে হাঁটাহাঁটি শুরু করে দিলাম। ভাই রে, তাও কি লাফানোটা যায়! হঠাৎ শব্দ করে ওঠে পেটের ভেতর — কক কক, কক কক।'

'মুরগি লাফাচ্ছিল নাকি!' চোখ বড় বড় করে ফেলেন বাতেন সরকার।

'জি, মুরগি লাফাচ্ছিল। তবে জ্যান্ত মুরগি না, মরা মুরগি!'

'বড় বিশ্রী একটা ব্যাপার।' চায়ের ট্রে নিয়ে রুমে ঢুকতে ঢুকতে নাতাশা মুমতাজ বলেন, 'কাল কোথা থেকে যেন শুনে এসেছে, মরা মুরগি বিক্রি হয় ইদানিং বিভিন্ন হোটেলে। সারাক্ষণ মাথার ভেতর ওটা ছিল!

রাতে ফারুব যখন মুরগি রান্না করে, ওটা মাথায় নিয়েই ইচ্ছে মতো সেগুলো খেয়েছে। তারপর যা হওয়ার তাই হয়েছে!' ট্রে থেকে সাদিদকে কফি আর বাতেন সরকারকে চায়ের কাপটা দিয়ে খালিদ সাহেবকে একটা মগ এগেয়ে দিলেন নাতাশা মুমতাজ। সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তি নিয়ে খালিদ সাহেব বললেন, 'চা দেবে তো আমাকে, স্যালাইন দিচ্ছো কেন!'

নাতাশা মুমতাজ আরো বেশি বিরক্তি নিয়ে বললেন, 'তোমার এখন ওটাই দরকার, পেটের ভেতরে লাফানো মুরগিগুলোকে চুবিয়ে মারার জন্য আরো বেশি দরকার!'

সাদিদের রুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বাতেন সরকার বললেন, 'সম্ভবত বিরক্ত করলাম আপনাকে। দরজায় অনেকক্ষণ শব্দ করার পর খুললেন তো, বোধহয় ঘুমাচ্ছিলেন!'

'স্যরি।' সাদিদ কিছুটা অপরাধী গলায় বলল, 'ফোনে কথা বলছিলাম, শুনতে পাইনি। আসুন, ভেতরে আসুন।'

বাতেন সরকার ভেতরে ঢুকে বললেন, 'আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন তো, ওই যে সকালবেলা খালিদ সাহেবের বাসায় দেখা হলো।'

'জি।'

'আমার নাম বাতেন সরকার।' হাত এগিয়ে দিতে দিতে বাতেন সরকার বললেন, 'ওনার বাসায় ভাড়া থাকি আমি।'

'আমি সাদিদ।' বাতেন সরকারের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে সাদিদ বলল, 'কোনো সমস্যা?'

লাজুক হাসি দিলেন বাতেন সরকার। পকেট থেকে এক হাজার টাকার একটা নোট বের করে বললেন, 'বাসায় একটা লোক এসেছে। সাতশ টাকা দিতে হবে তাকে। কিন্তু আমার কাছে এই এক হাজার টাকার একটা নোট আছে, ভাংতি হবে আপনার কাছে?'

প্যান্টের পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল সাদিদ। কিছু টাকা বের করে বলল, 'স্যরি, একটা একশ টাকার নোট আছে আমার কাছে, বাকীগুলো সব এক হাজার টাকার নোট।' মানিব্যাগটা আরো একটু ভালো করে দেখে সে বলল, 'না, একটা পাঁচশ টাকার নোটও আছে।'

লাজুক হাসিটা আরো বাড়িয়ে দিয়ে বাতেন সরকার বললেন, 'তাহলে তো মুশকিল হয়ে গেল! দুপুরের পর তো, আশপাশে বড় বড় সব দোকানই প্রায় বন্ধ। ছোট ছোট দোকানগুলো এক হাজার নোট দেখলেই চমকে ওঠে, ভাঙিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা!'

মানিব্যাগ থেকে পাঁচশ আর একশ টাকার নোট দুটো বের করে কিছু খুচরো টাকাও বের করল সাদিদ। সব মিলিয়ে সাতশ করে বাতেন সরকারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনি আপাতত এটা নিয়ে কাজ সারুন, বাকীটা পরে দেখা যাবে।'

টাকাগুলো হাতে নেওয়ার আগে এক হাজার টাকার নোটটা সাদিদের দিকে বাড়িয়ে দিলেন বাতেন সরকার। সঙ্গে সঙ্গে সাদিদ ইতস্তত ভঙ্গিতে বলল, 'না না, এটা লাগবে না। আপনি আপনার প্রবলেম সলভ করুন, পরে ভাঙিয়ে ফেরত দেবেন আমাকে।'

হতাশামূলক একটা শব্দ করলেন বাতেন সরকার, 'এটা আপনি কী বলছেন! ব্যাপারটা কেমন বিব্রতকর না?'

'মোটেই বিব্রতকার না। আপনি মুরব্বী মানুষ, আপনি বিব্রত হলে আমি নিজে আরো বেশি বিব্রত হবো।'

বাতের সরকার সাদিদের দিকে কৃতজ্ঞ চোখে তাকিয়ে ওর বাড়িয়ে দেওয়া টাকাগুলো হাতে নিলেন। নিজের এক হাজার টাকার নোটসহ সেগুলো পকেটে ঢুকাতে ঢুকাতে বললেন, 'মানুষ আর পশুর মধ্যে একটা পার্থক্য আছে, জানেন? একজন মানুষ ইচ্ছে করলেই আরেকজন মানুষকে যেকোনো ভাবে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু একটা পশু ইচ্ছে করলেই আরেকটা পশুকে সাহায্য করতে পারে না।' বাতেন সরকার তৃপ্তির একটা হাসি দিয়ে বললেন, 'আল্লাপাক আমাদের মানুষ করে সৃষ্টি করেছেন, দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা তাঁকে ডাকলেও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা শেষ করা যাবে না।'

'খুব সত্য কথা।' সাদিদ মুচকি হাসল। মুখে হাসি নিয়েই বাতেন সরকারের দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলল, 'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, এর আগে কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে।'

'দেখতেই পারেন, আর দেখাটাই খুব স্বাভাবিক।' বাতেন সরকার খুব স্বাভাবিক স্বরে বললেন, 'পৃথিবীটাই খুব ছোট, আমাদের দেশটা তো ম্যাপের ক্ষুদ্র একটা অংশ দখল করে আছে। ঘুরেফিরে আমরাই। দেখেন না, গত চল্লিশ বছরে আমাদের দেশে ঘুরেফিরে একই চেহারার মানুষ ক্ষমতায় এসেছে। ভালো কথা— ।' বাতেন সরকার আবার কৃতজ্ঞতার একটা হাসি দিয়ে বলেন, 'আজ বোধহয় আর বাইরে যাব না। কাল সকালে আপনার টাকাটা ফেরত দিতে চাচ্ছি আমি।'

'কোনো সমস্যা নেই।' ছোট্ট করে জবাব দিল সাদিদ।

ব্যাপারটা কারো সঙ্গে শেয়ার করা দরকার, কিন্তু কার সঙ্গে শেয়ার করবে বুঝতে পারছে না ফারুব। বাড়িতে এসেই এলোমেলো অনেক কাজ করেছে সে, ব্যাপারটা ভুলে থাকার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি। তবে লিজার সঙ্গে শেয়ার করা যেত, কিন্তু কেন যেন মন সায় দেয়নি। হোক সে খুব কাছের বন্ধু, প্রিয় বন্ধু। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হয়েছে, কয়েকদিন সে লিজাকে ফোন করেনি, ফোন রিসিভ করেনি ওর। খুব প্রিয়জন হলেই কি তাকে সব কথা বলা যায়? কিছু কথা থাকে নিজের জন্য, কেবল নিজের জন্য। শুধু নিজের কাছেই রাখতে হয় সেগুলো। মজার একটা ব্যাপার হচ্ছে, অনেক কথা প্রিয়জনকে বলা না গেলেও আধো পরিচিত, অল্প পরিচিত কাউকে বলা যায়। স্রেফ নিজের বুকটা হালকা করার জন্য, নিজের কাছ থেকে নিজের মুক্তি পাওয়ার জন্য!

দরজাটা খোলাই ছিল সাদিদের, ভাবতে ভাবতেই সেই দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ফারুব। আলতো করে দরজায় টোকা দিল। ক্যাকটাসের টবটা জানালার পাশ থেকে সরিয়ে রাখতে নিয়েই ঘুরে দাঁড়ায় সে। দরজার দিকে তাকাতেই ফারুব বলল, 'ভেতরে আসতে পারি, যদি আপনার কোনো সমস্যা না থাকে।'

টবটা আগের জায়গায় রেখে দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে গেল সাদিদ। হাতটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'প্লিজ, আসুন।'

ফারুব ভেতরে ঢুকে বলল, 'থ্যাংক ইউ।' তারপর ক্যাকটাসের টবটার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'পৃথিবীতে কত রকমের ক্যাকটাস আছে, জানেন?'

'না।' লাজুক হাসি দিল সাদিদ।

'কমপক্ষে ৫৩ রকমের।' ফারুব দেয়ালে লাগানো মুখোশটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'মানুষ অনেককিছু আবিষ্কার করেছে, ইদানিং আরো করছে। কিন্তু মানুষের একটা ব্যাপারে অনেক সীমাবদ্ধতা। আমি যতগুলো মুখোশ দেখেছি, মাত্র কয়েক রকমের মুখোশে। একই ধাঁচের, একই ভঙ্গিমার। আপনাকে যদি শুধুমাত্র মানুষের মুখ আঁকতে বলা হয়, আপনি বেশী হলে সাত-আট রকমের মানুষের মুখ আঁকতে পারবেন। তার পরেরগুলো আগেরগুলোর মতোই হয়ে যাবে। এর বাইরে কেন যেন আঁকতে পারে না

মানুষ। বিখ্যাত কিছু শিল্পীর নাম বলি আপনাকে—কাইয়ুম চৌধুরী, তাঁর ছবিগুলো একই ধরনের, মানুষের মুখগুলোও। হাশেম খানের ছবিগুলোও, মানুষের মুখগুলোও। এমন কি আমাদের আন্তর্জাতিক শিল্পী শাহাবুদ্দিনের ছবিগুলোও একই ধাঁচের। অথচ—।' ফারুব একটু হেসে বলেন, 'আমাদের কারো চেহারার সঙ্গে কারো চেহারার কোনো মিল নেই, দু একজন ছাড়া। স্রষ্টা অনেক বড় একজন শিল্পী।'

'একদম ঠিক।'

'সম্ভবত মানুষের চেহারার ভিন্নতার মতো মানুষের ভেতরটাও সবার আলাদা আলাদা।' ফারুব সমর্থনের আশায় সাদিদের দিকে তাকায়।

সাদিদ ম্লান হেসে বলল, 'সম্ভবত একটা জায়গায় সম্পূর্ণ মিল রয়েছে, প্রতিটা মানুষের ভেতরেই ভালোবাসা আছে। কেউ প্রকাশ করতে পারে, কেউ পারে না।'

'ঘৃণা?'

'ভালোবাসা-ঘৃণা বাদ দিয়ে এভাবে বলা যায়—প্রতিটা মানুষই ষড় রিপু দ্বারা আবৃত্ত। কারো কারোটা প্রকাশ পায়, কারোটা পায় না। মানুষে মানুষে পার্থক্য মূলত এখানে।'

ফারুব কিছুটা স্থিরভাবে সাদিদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা, একজন মানুষ যদি প্রতিনিয়ত অন্যায় করে, অন্য একজন মানুষ যদি সেটা জানে, জানার পর সেই অন্যায়কারীকে কী করা উচিত?'

'হাত দিয়ে বাধা দেওয়া উচিত।'

'সেটা না পারলে?'

'কথা দিয়ে বাধা দেওয়া উচিত?'

'সেটাও না পারলে?'

'অন্তর দিয়ে বাধা দেওয়া উচিত।' সাদিদ চেহারাটা একটু বিকৃত করে বলল, 'তাকে ঘৃণা করা উচিত।'

'এ তিনটার একটাও না করতে পারলে?' ফারুব খুব আগ্রহ নিয়ে সাদিদের দিকে তাকায়।

সাদিদ একটু সোজা হয়ে দাঁড়ায়। কিছুটা শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'করুণা করা উচিত।' সাদিদ একটু থেমে বলল, 'মানুষ কাকে করুণা করে, জানেন? বোধহীনদের, মানবতা-মনুষ্যত্বহীনদের।'

'কিন্তু যে এই করুণাও করতে পারে না?'

'সম্ভবত সেও বোধহীন।' সাদিদ হাসতে হাসতে বলল।

'বারো দিন আগে আমি একজন মানুষের গালে একটা থাপ্পর মেরেছি।' খুব শান্ত গলায় বলল ফারুব।

'কার গালে!' সাদিদ অবাক গলায় বলল।

'আমি যার আন্ডারে ইন্টার্নি করছি, তার গালে।'

'কেন?'

'মাত্র পাঁচ হাজার টাকা কম দেওয়ার জন্য একটা বাচ্চাকে অপারেশন করেননি তিনি। সারাদিন পর সন্ধ্যায় মারা যায় বাচ্চাটি। মাত্র আড়াই বছরের বাচ্চা, হার্টে একটা সমস্যা ছিল তার।' মুখ লাল হয়ে গেছে ফারুবের। শব্দ করে একটি নিঃশ্বাস ছেড়ে সে বলল, 'কথাটা জানতে পেরে স্যারের রুমে চলে যাই আমি। রুমে তখন কেউ ছিল না, কী যেন লিখছিলেন তিনি। আমি বলি, স্যার একটু তাকাবেন। স্যার তাকান। সঙ্গে সঙ্গে তার বাম গালে প্রচণ্ড একটা থাপ্পর দেই আমি।'

হাততালি দেওয়ার মতো হাত নাড়াতে নাড়াতে সাদিদ বলল, 'আমি হলে আরো একটা মারতাম। তারপর উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন। মানুষকে, মানবতাকে, মনুষ্যত্বকে জাগাতে হয় আঘাত করে, মানুষের সব ধরনের অন্যায় থামাতে হয় আঘাত করে। না হলে স্রষ্টা পৃথিবীটাকে মাঝে মাঝে এত অস্থির করে তোলেন কেন!'

বুকের ভেতর থেকে লম্বা বাতাস বের করে ফারুব হাসতে থাকে। তারপর সাদিদের একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'চলুন, আজ আমি নিজ হাতে আপনাকে কফি বানিয়ে খাওয়াব। কোনো সমস্যা নেই তো আপনার?'

'না নেই। কারণ মুরগির মাংস পেটের ভেতর কক কক করতে পারে, কিন্তু কফি কখনো কক কক করতে পারবে না।' সাদিদ হাসতে থাকে।

রান্নাঘরে ফারুবকে দেখে তামিয়া বলল, 'কফি বানাচ্ছিস ভাইয়া?'

'ইয়েস, স্পেশাল কফি।'

'এককাপ বানাচ্ছো?'

'না, দুই কাপ।'

'আরেক কাপ কে খাবে?'

'সাদিদ এসেছে, ড্রইংরুমে।'

'তাহলে চার কাপ বানাও। আমি আর অর্নাও আছি।' তামিয়া ফারুবের একটু কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, 'তার আগে তুমি একটা কাজ করতে পারো। তোমার মোবাইলে বেশ কয়েকটা কল এসেছে, একজনই করেছে। তুমি রুমে নেই, তাই কেউ রিসিভও করেনি সেটা। তুমি কি এবার কলটা ব্যাক করবে, এখনই?' তামিয়া অনুরোধের স্বরে বলল।

ফারুব সরে এলো না, কফিতেই ব্যস্ত হয়ে রইল। তামিয়া আরো একটু কাছ ঘেঁষে বলল, 'প্লিজ, ভাইয়া। মাত্র দশ সেকেন্ড কথা বলে আসো। পরে ম্যারাথন কথা বলো। ভাইয়া— ।' তামিয়া গলাটা গম্ভীর করে বলল, 'একজন মানুষের মন ভালো করে দেওয়ার চেয়ে সবচেয়ে ভালো কাজ আর কী আছে এই পৃথিবীতে, এত পুণ্যবান উৎসর্গ আর কী হতে পারে!' তামিয়া গলটা গাঢ় করে বলল, 'লিজা আপু খুব ভালো একটা মেয়ে, অন্যরকম একটা মানুষ।'

রান্নাঘরে ঢুকতে ঢুকতে অর্না বলল, 'ফারুব ভাইয়া, প্লিজ... ।' ইতস্তত পায়ে ফারুব রান্নাঘর থেকে বের হয়ে যেতেই অর্না বলল, 'তামিয়া, তোমার ফোনটাও বাজছে। তুমিও যাও।' হেসে ফেলল অর্না।

'ড্রইংরুমে সাদিদ আছে তো।'

'আমিও তো আছি। আমিও ভালো কফি বানাতে পারি।'

তামিয়া অর্নার দু কাঁধে দুটো হাত রেখে বলল, 'মানুষের জীবনের দুঃখের চেয়ে সুখের সময়টাই বেশি, তাই না?'

কিছু বলল না অর্না। কফি বানাতে লাগল সে যত্ন করে।

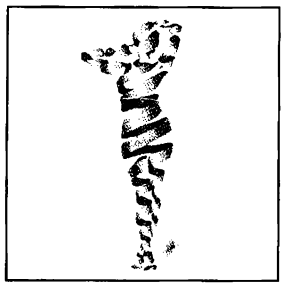

খুব যত্ন করে দশ পয়েন্টের একটা লিস্ট তৈরি করেছেন খালিদ সুবহান সাহেব। বিভিন্ন পত্রিকা ঘেঁটে, বই পড়ে তৈরি করেছেন এটা। তিনি মনে করেন, একজন মানুষ যদি লিস্টের এই পয়েন্টগুলো মনে রাখে, মেনে চলে, জীবনটা তাহলে অন্যরকম হয়ে যাবে তার। পূর্ণাঙ্গ একটা উপভোগ্য জীবন, সুন্দর একটা সময়, আনন্দময় মুহূর্ত। তার ইচ্ছে আছে, লিফলেটের মতো এক বা দুই পাতার একটা কাগজে এগুলো ছাপিয়ে সারা দেশে বিলি করবেন, এতে ষোল কোটি মানুষের ষোলজন মানুষ যদি উপকৃত হয়, এটা থেকে কিছু শিখতে পারে, জীবন পরিচালিত করতে পারে এভাবে, তবেই তিনি স্বার্থক।

খালিদ সুবহান সাহেব তার রুল-টানা খাতাটার দিকে আরো ভালো করে তাকালেন। কোনো কিছু ভুল আছে কিনা, তা বের করার চেষ্টা করলেন। একটা জায়গায় একটা কমা দেওয়ার দরকার ছিল, সেখানে কমাটা দিয়ে পুরো দশটা পয়েন্ট আবার পড়তে শুরু করলেন তিনি।

০১. জীবন হচ্ছে—

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আহবান—এর সম্মুখিন হও, দান—এটা গ্রহণ করো, দুঃসাহসিক অভিযান—এ অভিযানে সাহসী হও, দুঃখ—এটাকে জয় করো, শোকাবহ ঘটনা—এটাকে মেনে নাও, কর্তব্য—এটাকে কাজে পরিণত করো, খেলা—এটা নিয়ে খেলা করো, রহস্য—এটাকে উন্মোচন করো, গান—এটা গাও, সুযোগ—গ্রহণ করো এটা, সংকল্প—এটা পূর্ণ করো, সংগ্রাম—এর সঙ্গে যুদ্ধ করো, ধাঁধা—এর সমাধান করো, ভালোবাসা—দয়া করে এটাকে ভালোবাসো।

০২. অভ্যাস

মানুষ অভ্যাসের দাস, আবার অভ্যাসও মানুষের দাস। যদি তিনটি অভ্যাসকে দাস করা যায়, তাহলে তার জন্য নির্ধারিত তিনটা পুরস্কার আছে।

মৌনতার পুরস্কার—শান্তি, স্রষ্টার প্রতি ভীরুতার পুরস্কার—মর্যাদাপ্রাপ্তি, সেবার পুরস্কার—নেতৃত্ব লাভ।

আবার ইচ্ছাশক্তিতে বলবান হতে নয়টা অভ্যাস খুব জরুরি।

* মনে রাগ হলে হেসে ফেলা * মনে কটুতা এলে মধুর কথা বলা * মগজ হালকা বোধ করলে ভালো কিছু চিন্তা করা * অপছন্দের কিছু সামনে এলে তার প্রশংসায় কিছু বলা * প্রতিদিন কিছু ত্যাগ করা, তা সেটা যত তুচ্ছই হোক * যদি কেউ বাধা হয় তার সম্পর্কে ভালো কথা বলা * দুঃখ-কষ্টেও খুশী থাকা * যে কারণে কষ্ট হচ্ছে, তার জন্যও স্রষ্টাকে ধন্যবাদ দেয়া * স্বাচ্ছন্দ্য থাকলে অন্যকে সাহায্য করা, তা যত সামান্যই হোক।

০৩. মুখাপেক্ষী

চারটি বিষয় চারটি বিষয়ের মুখাপেক্ষী—ভদ্রতা, আদরের প্রতি; আনন্দ, নিরাপত্তার প্রতি; আত্মীয়তা, ভালোবাসার প্রতি; জ্ঞান, অভিজ্ঞতার প্রতি।

০৪. সুখী

আপনি যদি সুখী হতে চান—এক ঘণ্টার জন্য, তাহলে একটি ঘুম দিন; একদিনের জন্য, তাহলে বনভোজনে যান; এক সপ্তাহের জন্য, তাহলে কোথাও গিয়ে ছুটি কাটান; এক মাসের জন্য, তাহলে একটা বিয়ে করুন; এক বছরের জন্য, তাহলে স্বাস্থ্য ঠিক রাখুন; আজীবন, আপনি যে কাজটা করছেন সেটাকে ভালোবাসুন।

সুখী দাম্পত্যের জন্য পুরুষের অবশ্য দুটি করণীয় আছে—* যখনই কোনো ভুল করবেন, সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতে ভুলবেন না। * যদি আপনার কথাই ঠিক হয়, তাহলে মনের ভুলেও সেটা বলতে যাবেন না।

০৫. ব্যক্তিত্ব

আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব হতে হলে কিছু কিছু উপাদান থাকার দরকার—* বন্ধু বাৎসল্য * উদারতা * মুক্তবুদ্ধি * সহানুভূতি * কর্তব্যবোধ * আনন্দঘন মুখরতা।

ব্যক্তিত্ব অর্জন করার জন্য আরো বেশ কিছু কাজ করতে হয়—* আদর্শ লালন করতে হয় * দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হয় * মার্জিত আচরণের হতে হয় * অজানা বিষয়ে বিরত থাকতে হয় * স্বাধীন চিন্তা করতে হয় * পারিপার্শ্বিক জ্ঞান রাখতে হয় * চলমান ঘটনাবলী জানতে হয় * স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হয় * সঠিক ব্যবহার জানতে হয় * তুচ্ছ চিন্তা দূর করতে হয়।

০৬. বিপর্যয়

মানুষের জীবনে বিপর্যয় অনিবার্য। তা রোধ করা যায়। কিন্তু তিনটি সাধারণ বিষয়ে তিনটি বিপর্যয় আসতে পারে—* ভুল—যখন বোকামির পর্যায়ে চলে যায়, ত্রুটি-বিচ্যুতি—অপরাধতুল্য হয়ে দাঁড়ায়, সরলতা—মূর্খতার স্তরে পৌঁছে যায়।

০৭. সফল

সফল যে, সে জানে; ব্যর্থ যে, সেও জানে। সফল যে, সে বিশ্বাস করে, ব্যর্থ যে, সেও বিশ্বাস করে। তবে সফল যে, সে ভাবে, আমার দ্বারা সম্ভব, ব্যর্থ ভাবে, আমার দ্বারা সম্ভব না।

সফলতার কিছু সোপান আছে—সাধনা, লক্ষ্যে পৌঁছায়; অধ্যবসায়, সফলতা আনে; বুদ্ধি, প্রতিষ্ঠিত করে।

০৮. সামলানো

* প্রার্থনায় মন সামলাতে হয় * আড্ডায় বাক্য সামলাতে হয় * ক্রোধে নিজেকে সামলাতে হয় * আহারে পেট সামলাতে হয়।

০৯. নষ্ট

১০টা কাজে ১০টা কাজ নষ্ট হয়—* ক্ষমা চাইলে পাপ নষ্ট হয় * রাগ করলে জ্ঞান নষ্ট হয় * মিথ্যা বললে রুটি-রোজগার নষ্ট হয় * অহংকার করলে বিদ্যা নষ্ট হয় * পুণ্য করলে খারাপ কাজ বন্ধ হয় * সাহায্য করলে বিপদ-আপদ দূর হয় * খোঁটা দিলে সৎ গুণাবলী নষ্ট হয় * পরনিন্দা করলে ভালো কাজ নষ্ট হয় * চিন্তা করলে আয়ু নষ্ট হয় * ন্যায়বিচার করলে অত্যাচার দূর হয়

১০. ব্যায়াম

ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য ব্যায়াম খুব জরুরি। কিন্তু মানুষ ব্যায়াম করার এখন সময়ই পায় না। কিন্তু ৬ সেকেন্ডে ৭ টা

ব্যায়াম করলেই চলবে—* হাত-পা ছুড়ে শরীর টানটান করুন * দেয়াল বা পিলারে পিঠ লাগিয়ে মেরুদণ্ড সোজা করুন * বুক প্রশস্ত করুন, শ্বাস নিন * ঘাড় ঘোরান, উপর-নিচ-চারপাশে * পেটের পেশি ভেতরে টানুন * হাত ভাঁজ করুন, ধাক্কা দিন, টানুন * পা ভাঁজ করুন, হাঁটুন, ওট-বস করুন।

ফলাফল : স্লিম হবেন, শক্তিশালী হবেন, সর্বোপরি মানসিকভাবে চাঙা হবেন।

পয়েন্ট ১০টা পড়ে আনন্দের একটা হাসি দিলেন আবার খালিদ সুবহান সাহেব। দু হাত পরস্পরের সঙ্গে ঘষে মুখ দিয়ে তৃপ্তির একটা শব্দও করলেন। ব্যাপারটা নিয়ে কারো সঙ্গে একটু পরামর্শ করা দরকার। মানুষ মানুষের জন্য কত কিছু করে, কত কষ্ট করে, আর তিনি সামান্য কয়েক হাজার লিফলেট ছাপাতে পারবেন না!

সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। এ মুহূর্তে পরামর্শ করার মতো একজনই আছে—সাদিদ। সাদিদের কাছে যাওয়ার জন্য তিনি যেই না পা বাড়াবেন, সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল কলিংবেলটা। কপাল কুঁচকে ফেললেন তিনি, এ সময় আবার কে এলো!

দরজা খুলে দিলেন খালিদ সাহেব। হাসিবুল পাটোয়ারী দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে। তাকে দেখে, প্রচণ্ড মন খারাপ হয়ে গেল তার সঙ্গে সঙ্গে। গ্রাম থেকে মাঝে মাঝেই তার বাসায় আসে সে। প্রতিবারই একটা না একটা সমস্যা নিয়ে আসে, সেগুলোর সমাধানও করে দেন তিনি। অথচ সে তার আপন কেউ না, গ্রাম্য ভাই।

খালিদ সাহেব ফিক করে হেসে ফেললেন হঠাৎ। দুই নম্বর পয়েন্টটা মনে পড়েছে তার—মনে রাগ এলে হেসে ফেলা। হাসতে হাসতে তিনি বললেন, 'কী ব্যাপার, হাসিবুল?'

হাসিবুল ব্যাপারীও মুখটা হাসি হাসি করে বললেন, 'ভাইজান, কাল রাতে আপনাকে নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখছি, খুবই ভালো স্বপ্ন। ভাবলাম ফোনে জানাই, কিন্তু এত ভালো একটা কথা ফোনে জানাই কীভাবে? তাই—।' হাতের মিষ্টির প্যাকেটটা দেখালেন পাটোয়ারী, 'মিষ্টিসহ চলে এলাম আপনার কাছে। কথাটা বলার জন্য মনটা অস্থির হয়ে যাচ্ছিল আমার।'

খালিদ সাহেব মনে মনে বললেন, হারামজাদা। মিথ্যা কথা বলার আর জায়গা পাও না। এটা ওটা বলে ধান্ধাবাজি করতে এসেছো। এর আগেও করেছ। চেহারাটা শক্ত হয়ে যাচ্ছে তার, টের পেলেন তিনি। দ্রুত সেটা আবার নরম করে ফেললেন—মনে কটুতা এলে মধুর কথা বলা। এটা মনে পড়ে যেতেই তিনি বেশ উচ্ছ্বাস নিয়ে বললেন, 'তাই নাকি। আয় আয়, ভেতরে আয়।'

হাসিবুল পাটোয়ারী জুতা খুলে ঘরে ঢুকেই মিষ্টির প্যাকেটটা খালিদ সাহেবের হাতে দেয় বললেন, 'খুব ভালো কিছু মিষ্টি নিয়ে এসেছি আমি। একবার খেলে আবার খেতে চাইবেন!'

ভীষণ অপছন্দ করলেন তিনি কথাটা। চেহারাটা আবার আগের মতো হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সেটা থামালেন তিনি—অপছন্দের কিছু সামনে এলে তার প্রশংসা করা। খালিদ সাহেব অতি কষ্টে এক টুকরো হাসি এনে বললেন, 'তুই তো কখনো খারাপ জিনিস আনিস না আমার জন্য। ভালো জিনিস ছাড়া তোর হাতে কোনো কিছু তো ওঠেই না। হা হা হা।' খালিদ সাহেব টের পেলেন হাসিটা ঠিক হাসি হয়ে উঠল, কেমন যেন খাঁ খাঁ শোনাল। হাসিটাকে আরো একটু টেনে ধরে, সোফা দেখিয়ে তিনি বললেন, 'বোস না ওখানে।'

সোফায় বসে হাসিবুল পাটোয়ারী হাতের আরেকটা পোঁটলা সামনে এনে বললেন, 'ভাইজান, ভাবীজানকে ডাকেন। ওনার জন্যও কিছু জিনিস নিয়ে এসেছি, খুবই ভালো জিনিস।'

খালিদ সাহেব এবার সম্পূর্ণটা বুঝে গেলেন—এবার বেশ বড় সড় একটা ধান্ধাবাজিতে এসেছে হাবিবুল। তিনি পাশের একটা সোফায় বসতেই হাসিবুল বললেন, 'খাঁটি দেশি মুরগির ডিম এনেছি ভাইজান। ফার্মের মুরগির ডিম খেতে খেতে তো জিভায় বোধহয় চর পড়ে গেছে আপনাদের। দেশি ডিমের স্বাদের কথাও তো বোধহয় ভুলে গেছেন!'

বুকের ভেতর কষ্ট হতে লাগল খালিদ সাহেবের। এরকম একটা বাজে মানুষের সব জেনেও তিনি কিছু বলতে পারছেন না। তবু তিনি হাসি হাসি করে রাখলেন মুখটা, কারণ দুঃখ-কষ্টেও হাসি-খুশি থাকার দরকার। ২ নম্বর পয়েন্টে এটাও আছে।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন তিনি। তারপর পাটোয়ারীর দিকে ভালো করে তাকিয়ে বললেন, 'কোনো সমস্যা নিয়ে এসেছিস নাকি!'

মাথা নিচু করে সেটা চুলকাতে চুলকাতে পাটোয়ারী বললেন, 'ভাইজান, সমস্যা ছাড়া তো আপনার কাছে আসাই হয় না। বড় শরমের মধ্যে আছি।'

'কীসের শরম!' স্বাভাবিক গলায় বললেন খালিদ সাহেব।

'মেয়েটার বিয়ে। খালি হাতে তো আর দেওয়া যায় না। এদিকে হাতে যা ছিল বাকী আয়োজন করতেই শেষ হয়ে গেছে।' পাটোয়ারী আগের মতোই মাথা চুলকাতে থাকেন।

সোজা হয়ে বসলেন খালিদ সাহেব, 'তোর তো দুটো মেয়ে ছিল, আমি তো জানি দুটোরই বিয়ে হয়ে গেছে। সাহায্যও করেছিলাম আমি। আরেকটা আবার আসলো কোথা থেকে?'

'শরমের কথা।'

'কী শরমের কথা শরমের কথা বলছিস! কেশে ঝাড় তো।'

মাথা চুলকাতে চুলকাতেই পাটোয়ারী একপলক খালিদ সাহেবের দিকে তাকালেন, তারপর আবার মাথা নিচু করে বললেন, 'আমার ছোট বউয়ের মেয়ে এটা।'

'তুই দুটো বিয়ে করেছিস নাকি!' রাগতে গিয়েই আবার হেসে ফেলেন খালিদ সাহেব—স্বাচ্ছন্দ্য থাকলে অন্যকে সাহায্য করা, প্রতিদিন কিছু ত্যাগ করা। চোখের সামনে ভেসে উঠল কথাগুলো। মগজ তবুও হালকা বোধ করছে না, ভালো কিছু চিন্তাও করতে পারছেন না। খালিদ হঠাৎ চিৎকার করে বললেন, 'মা তামিয়া, আইস ব্যাগে কিছু বরফ ভরে নিয়ে আয় তো মা! মগজটা ভারী হয়ে গেছে, একটু হালকা করা দরকার!'

সাদিদের দিকে এগিয়ে গিয়ে তামিয়া বলল, 'শুনুন মশাই, আব্বুর তো মাথা খেয়ে ফেলেছেন আপনি। আপনাকে ছাড়া কিছুই ভাবতে চান না আর। আপনাকে ডেকেছেন।'

'এখনই?'

'না, আধা ঘণ্টা পরে গেলে চলবে। মাথা গরম হয়ে গেছে। আম্মু ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়েছেন, আপাতত ঘুমিয়ে আছেন। ভালো কথা—।' তামিয়া ঘরের চারপাশটায় একবার চোখ বুলিয়ে বলল, 'আপনার ঘর তো আরো একটু গোছানো বাকী আছে।' অর্নাকে দেখিয়ে বলল, 'আপনারা ঘর গোছানো শেষ করুন, আমি ও ঘরে গেলাম। একটা অস্থিরতার মধ্যে কালানিপাত করিতেছি আমি। আধা ঘণ্টা কথা বলি, সব ঠিক হয়ে যাবে।' মোবাইলটা হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে পাশের ঘরে চলে গেল তামিয়া।

সাদিদ মুখটা হাসি হাসি করে অর্নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'কাল খুব মন খারাপ ছিল আপনার, না?' সাদিদ নরম গলায় বলল, 'জানা যাবে, কেন?'

'না।' অস্পষ্ট আর ছোট্ট করে বলল অর্না।

'ওকে।' সাদিদ একটু থেমে বলল, 'একটা কথা বলি?' অর্নার উত্তর পাওয়ার আগেই সে বলল, 'বলুন তো, কোনো প্রেমিকা তার প্রেমিকের মনে খুব সহজে সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে কীভাবে?'

কিছু বলল না অর্না, একপলক সাদিদের দিকে তাকিয়ে নিচু করে ফেলল মাথাটা। সাদিদ হাসতে হাসতে বলল, 'বেশি কিছু না, প্রেমিকের মোবাইলে হঠাৎ একটা মেসেজ পাঠিয়ে দিলেই চলবে—I love you too।'

অর্না এবারও কিছু বলল না, একটু হাসল। সাদিদ সেই হাসির জবাব দিতে দিতে বলল, 'এটা বলুন তো, ছেলে এবং মেয়েরা কেন একে অপরকে সহজে বুঝতে পারে না?

'কেন?' এবারও ছোট্ট করে বলল অর্না।

'কারণ স্রষ্টা ছেলেদের ভালো বুদ্ধি দিয়েছেন, মেয়েদের দিয়েছেন ভালো হৃদয়, কিন্তু জীবনে চলার পথে ছেলেরা ব্যবহার করে তাদের হৃদয়, মেয়েরা করে বুদ্ধি।'

'মোটেই না। এটা একটা ভুল কথা।'

বুকের ভেতরটা আস্তে করে নেচে উঠল সাদিদের। নাচনটা একটু একটু বেড়ে যাচ্ছে। ভালোবাসাবাসির কথাটা তাহলে শুরু করা যাবে! পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করল সে, এখন না, এত তাড়াতাড়ি না, অন্য সময়। যাক, তবে শুরুটা তো করা গেছে।

প্রসঙ্গ দ্রুত পাল্টানোর জন্য এবার একটু শব্দ করে হেসে উঠল সাদিদ, 'মা, আমি পরীক্ষায় পাশ করেছি। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছি।' সাদিদ হঠাৎ থেমে বলল, 'স্যরি, এটা একটা বাংলা সিনেমার সংলাপ।' অর্না মুচকি হেসে সাদিদের দিকে তাকাতেই ও বলল, 'ডোন্ট অরি, অপারেশন সাকসেসফুল।' সাদিদ আগের মতোই হেসে বলল, 'এটাও একটা বাংলা সিনেমার সংলাপ।' সাদিদ আগের মতোই হেসে বলল, 'আরো একটা শুনবেন?'

মাথাটা একটু কাত করল অর্না। সাদিদ তার সমস্ত উৎফুল্লতা নিয়ে বলল, 'আমি তোমাকে ছেড়ে বাঁচব না, জান, কক্ষনো না।'

সাদিদকে দেখেই জড়িয়ে ধরার মতো করে খালিদ সুবহান সাহেব বললেন, 'কাল কোথায় ছিলে তুমি? দুটো চমৎকার আইডিয়া মাথার ভেতর স্টল করে ঘুরছি, তোমাকে না বলা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না।' সোফা দেখিয়ে ইশারায় সেখানে বসতে বলে তিনি বললেন, 'উত্তেজনায় রাতে তেমন ঘুমাতে পারিনি। কী যে যন্ত্রণা!' সোফায় বসলেন তিনি নিজেও, 'ভালো কথা, ঘুম থেকে উঠেছিলে, না সুমী গিয়ে ভাঙিয়েছে?'

'না, আমি নিজেই উঠেছিলাম।'

'তোমাকে কি আইডিয়া দুটো বলব?'

'সিওর।' আরো একটু সোজা হয়ে বসল সাদিদ।

খালিদ সাহেব দরজার দিকে তাকালেন, 'বাতেন সাহেবকে অবশ্য ডাকতে পাঠিয়েছি। ঠিক আছে, উনি আসার আগে তোমাকে বলি। উনি এলে আবার বলা যাবে।' হাতের কাগজটার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা পড়ে খালিদ সাহেব বললেন 'প্রতিদিন সকালে একটা প্রোগাম করব আমরা। অন্যরকম একটা প্রোগাম। তার আগে একটা ব্যায়াম করব আমরা ছয় সেকেন্ডের।'

'ছয় সেকেন্ড!'

'হ্যাঁ, ছয় সেকেন্ড।' খালিদ সাহেব আরো একবার হাতের কাগজটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খুব সাধারণ একটা ব্যায়াম, কিন্তু অসাধারণ তার রেজাল্ট। শোনো সাদিদ— ।' দরজার দিকে একপলক তাকিয়ে খালিদ সাহেব বললেন, 'ব্যায়ামকে অনেকেই খুব কঠিন কাজ ভাবে। আসলে এটা মোটেই কঠিন কাজ না। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর রাতে বিছানায় যাওয়ার আগ পর্যন্ত অনেকভাবে ব্যায়াম করা যায়। এই ধরো— ।' খালিদ সাহেব কী একটা ভেবে বললেন, 'তার আগে একটা ঘটনা বলি তোমাকে।

মতিঝিলে যে অফিসটায় আমি চাকরি করতাম, সেটা ছিল একটা নয়তলা বিল্ডিংয়ের পাঁচতলায়। আমরা সবাই লিফটে করে উঠতাম। আমাদের অফিসে প্রতিদিন না হলেও দশ-বারোজন ফরেনার আসত। কিন্তু তাদের কাউকেই আমরা কখনো লিফটে উঠতে দেখিনি। ঝটঝট তারা দৌড়ানোর মতো করে সিঁড়ি বেয়ে উঠত, নামতও দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে। মেদ কাকে বলে তাদের শরীরে তা দেখা যেত না, ভুঁড়ি তো দূরের কথা। কিন্তু ত্রিশ না পেরুতেই আমাদের বাঙালিদের মণখানেক ওজনের ভুঁড়ি দেখা যায় শরীরের সঙ্গে। তারপর হার্ট ডিজিস, ডায়াবেটিস, প্রেশার, আরো কত কী!'

'খুব সত্য।'

'তাই সকালে প্রোগ্রামটা শুরু করার আগে ৬ সেকেন্ডের ব্যায়াম।' খালিদ সাহেব আবার দরজার দিকে তাকালেন, 'তারপর আমরা সবাই সোজা হয়ে দাঁড়াব, পুব দিক মুখ করে।'

'আমরা কারা?'

'আমরা বলতে আমরা যারা এই বিল্ডিংয়ে থাকি, তারা।'

'আন্টিও থাকবেন নাকি?'

'হ্যাঁ। তামিয়া, অর্না, অন্যান্য ভাড়াটেদের স্ত্রী, ছেলে-মেয়েরাও থাকবে।' খালিদ সাহেব আবার দরজার দিকে তাকালেন, 'আমরা একটা হাসির প্রোগাম করব। সবাই এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে, পুবের সূর্যের দিকে তাকিয়ে, বুকের সব বাতাস বের করে দিয়ে, হো হো করে হাসব। এতে কয়টা উপকার হবে, জানো? এক. বুকের সব বাসি বাতাস বের হয়ে যাবে, নতুন বাতাস বুকে প্রবেশ করবে, দুই. ফুসফুস হবে আরো সক্রিয়, তরতাজা, তিন. মনের যত ক্লেদ-দুঃখ-হতাশা আছে, সেটও ভেতর থেকে বের হয়ে যাবে, চার. যারা সকালে ঘুম থেকে উঠতে চায় না, তারা আমাদের হাসির শব্দ শুনে উঠে পড়বে, পাঁচ. সারা দুনিয়া না হোক, আমাদের এলাকার সবাই জানতে পারবে, হাসি বলে একটা জিনিস আছে, সবাই মিলে সেটা করা যায়।'

'কিন্তু — ।' সাদিদ বেশ দ্বিধা নিয়ে বলল, 'সবার সঙ্গে আন্টি, তামিয়া, অর্না শব্দ করে হাসবে কী করে!'

'কেন! সমস্যা কোথায়!' খালিদ সাহেব সাদিদের দিকে একটু ঝুঁকে বসে বললেন, 'সবাই মিলে যদি হিন্দী সিনেমার স্বল্প-বসনা মেয়েদের দেখতে

পারি, ড্রইংরুমে বসে চোখের পলক না ফেলে সুরত সুরত করে চা খেতে পারি, তাহলে শব্দ করে হাসতে অসুবিধা কোথায়! বরং সবাই মিলে একসঙ্গে কাঁদলে সমস্যা। চোখের পানিতে আশপাশ এলাকা বন্যার পানির মতো ভেসে যাবে। হা হা হা।' খালিদ সাহেব হাসিটাকে প্রলম্বিত করতে নিয়েই থেমে যান। দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকেছে সুমী, 'মামা, বাতেন মামা তো বোধহয় চলে গেছে।'

'চলে গেছে মানে!' কপাল কুঁচকে ফেললেন খালিদ সাহেব।

'ঘরে তো কিছুই নাই, সব প্রায় পরিষ্কার।'

'কী!' কিছুটা লাফ দেওয়ার মতো উঠে দাঁড়ান খালিদ সাহেব, 'কাল দুপুরে আমি তাকে ব্যাংক থেকে নগদ এক লাখ পনের হাজার টাকা তুলে দিয়েছি।'

'কেন!' সাদিদও উঠে দাঁড়ায়।

'ওনার ছেলে নাকি সেনেগালে থাকে, কী একটা অসুবিধায় পড়েছে, দ্রুত টাকাগুলো পাঠাতে হবে।' খালিদ সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন, 'বড্ড বুদ্ধিমান মানুষ। আমার কাছে একটু একটু করে চল্লিশ হাজার টাকার মতো জমিয়েছিলেন। তার প্রতি আমার এক ধরনের বিশ্বাস তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেই চল্লিশ হাজার টাকার বিশ্বাসের বিনিময়ে এক লক্ষ পনের হাজার টাকা নিয়ে তিনি পালিয়েছেন। ভেরি গুড।' খালিদ সাহেব হাসিটা আরো বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'জীবন হচ্ছে একটা শোকাবহ ঘটনা, এটাকে মেনে নাও; এটা একটা খেলা, খেলে যাও; এটা একটা দুঃখ, এটাকে জয় করো।' জয়ীর মতো হাসতে লাগলেন খালিদ সাহেব, 'জীবন একটা দুঃসাহসিক অভিযান, বাতেন সরকার এ অভিযানে সাহসী হয়েছেন; এটা একটা খেলা, তিনি খেলছেন; এটা একটা সংগ্রাম, তিনি এটার সঙ্গে যুদ্ধও করছেন।' খালিদ সাহেব একটু থেমে বলেন, 'সাধনা মানুষকে লক্ষ্যে পৌঁছায়, অধ্যবসায়ে সফলতা আনে আর বুদ্ধি করে প্রতিষ্ঠিত। বাতেন সরকার বুদ্ধিমান।'

সাদিদ একটু চঞ্চল হয়ে বলল, 'এবার ধরতে পেরেছি। ঢাকা শহরের আশপাশেই ঘুরে বেড়ান তিনি। আর যে বাসাতে ভাড়া থাকেন, সেই বাসার কিছু একটা ক্ষতি করে অন্য এলাকায় চলে যান। আমাদের এলাকাতেও ছিলেন তিনি।'

'তাই নাকি!'

'কালকে, হ্যাঁ কালতেই তো, আমার রুমে গিয়েছিলেন তিনি। তাকে বলেছিলাম, আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি। তিনি তখন একটা কিছু বুঝিয়ে দিলেন আমাকে।'

'তোমার রুমে গিয়েছিলেন কেন তিনি?'

সাদিদ মুচকি হেসে বলল, 'এমনি।' প্রতারিত হওয়ার কথা সবাইকে বলা যায় না, এটা জানে সাদিদ।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন খালিদ সাহেব, 'তিনটি সাধারণ বিষয়ে বিপর্যয় আসতে পারে—ভুল যখন বোকামির পর্যায়ে চলে যায়, ত্রুটি-বিচ্যুতি যখন অপরাধতুল্য হয়ে দাঁড়ায়, সরলতা যখন মূর্খতার স্তরে পৌঁছ যায়।' খালিদ সাহেব আবার শব্দ করে হেসে উঠলেন, 'বাবা সাদিদ, আমার ক্ষেত্রে কোনটা ঘটেছে, বলো তো?'

ফারুব রান্নাঘরে ঢুকে বলল, 'আম্মু, আব্বুর কী হয়েছে বলো তো? সেই সকাল থেকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে!'

'তোর আব্বুকে ভূতে ধরেছে।' হাসতে থাকেন নাতাশা মুমতাজ।

'একটু আগে আমার রুমে ঢুকে বললেন, ফারুব তোর কাছে শক্ত কোনো টেপ আছে? আমি অবাক হয়ে তাকাতেই বললেন, দুই ঠোঁটের কোনা থেকে লাগিয়ে কানের ওপর পর্যন্ত তুলব। যাতে ঠোঁট বাঁকানো দেখে সবাই ভাবে, আমি হাসছি। ডগমগ করে হাসছি।'

'তোর বাবার হাসি আসলে শেষ হয়ে গেছে তো!'

'তুমি গিয়ে একটু থামাও তো।'

'লাভ হবে না। একটু পর এমনিতে ঠিক হয়ে যাবে।' নাতাশা মুমতাজ হাসতে হাসতে বললেন, 'তুই বরং একটা কাজ কর। সেদিন মুরগির মাংস রান্না করে খাওয়েছিলি তোর আব্বুকে, পেটের ভেতর মুরগি ডেকেছে। আজ গরুর মাংস রান্না করে খাওয়া, গরু আর হাম্বা হাম্বা করবে না, একেবারে গুঁতোতে গুঁতোতে তোর আব্বুর পাগলামি দূর করে ফেলবে!'

'তামিয়াকে পাঠিয়ে দেই?'

'না, কাউকেই যেতে হবে না, আমিই যাই।'

বেডরুমে ঢুকেই নাতাশা মুমুতাজ দেখেন, আয়নার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন খালিদ সাহেব। একটু এগিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, 'আপনি সেই কখন থেকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, কেন?'

'নিজেকে দেখছি।'

'আয়নায় তো নিজেকেই দেখা যায়, কিন্তু এতক্ষণ ধরে দেখার কী হলো!' একটু রূঢ় স্বরে বললেন নাতাশা মুমতাজ।

'নিজের একটা হাসি মুখ দেখার ইচ্ছে হয়েছে আমার। অনেকক্ষণ ধরে হাসার চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না। ভালো কথা— ।' আয়নার সামনে থেকে সরে আসলেন খালিদ সাহেব, 'ডাক্তারকে একটা ফোন করি তো।' খাটের পাশ থেকে মোবাইলটা হাতে নিয়ে নাম্বার চাপ দিলেন তিনি। ওপাশে রিসিভ হতেই কিছুটা রাগী রাগী গলায় বললেন, 'ডাক্তার, এতদিন তুমি কথা বলেছ, আমি শুনেছি; আজ আমি কথার বলব, তুমি শুনবে।'

ডাক্তার শাহরিয়ার আবদুল্লাহ হাসতে হাসতে বললেন, 'সিওর।'

'তোমরা এত কিছু আবিষ্কার করেছ, আর হাসির ঔষধ আবিষ্কার করতে পারো নাই!' খালিদ সাহেব চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন।

'কে বলল হাসির ঔষধ আবিষ্কার হয় নাই!'

'কই হয়েছে?' খালিদ সাহেব আগের মতোই রাগী রাগী গলায় বললেন, 'আরে, ওরকম একটা ঔষধ আবিষ্কার করা জরুরি। ওই ঔষধ খেয়ে লাফাতে লাফাতে হাসব, চিৎ হয়ে হাসব, উপুড় হয়ে হাসব, কাজ করতে করতে হাসব, চুপচাপ বসে বসে হাসব, গড়াতে গড়াতে— ।'

খালিদ সাহেবকে থামিয়ে দিয়ে শাহরিয়ার আব্দুল্লাহ বললেন, 'কারো যখন গ্যাস্ট্রিকে পেটে ব্যথা হয়, ব্যথায় চিৎকার করতে থাকে, তখন একটা ইনজেকশন দিয়ে ব্যথাটা কমিয়ে ফেলা হয়। কান্না কান্না মুখটা হাসি হাসি হয়ে ওঠে তার। কারো যখন জ্বর হয়, প্যারাসিটামল জাতীয় কোনো ঔষধ খাওয়ার পর তাকে সতেজ দেখায়। কারো যখন পেটে সমস্যা হয়, কোনো অ্যান্টোবায়োটিক দিলেই সে সুস্থ হয়ে ওঠে। এবার বলুন, এগুলো আসলে কীসের ঔষধ? দুঃখ-কষ্ট দূর করে মুখে হাসি ফোটানোর ঔষধ।'

কলিংবেলটা বেজে উঠল হঠাৎ। খালিদ সাহেব বললেন, 'ডাক্তার এখন রাখি, পরে আবার ফোন করছি।' মোবাইলটা বিছানার পাশে রেখে বাইরের ঘরের দরজার যেতে লাগলেন তিনি। টিভিরুমে এসেই থমকে দাঁড়ালেন।

খুব মনোযোগ দিয়ে টিভি দেখছে সুমী। তিনি একটু এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'ওই ছেমরি, কলিংবেল যে বাজছে, সেটা শুনতে পাচ্ছিস?'

'নেহি।'

'এত জোরে বাজছে তাও শুনতে পাসনি!'

'মেরে মাদাদ করুন, মামা। স্যরি, আমি আপনার দিকে তাকাতেও পারছি না। একটা সিন মিস মানে পুরা সিরিয়ালটাই মিস।'

'তুই একটা খবিস।'

'ঝুট বলা, মামা।' সুমী সিরিয়াল থেকে চোখ সরাল এবার। খালিদ সাহেবের দিকে তাকিয়ে মুচকি একটা হাসি দিয়ে বলল, 'বাতেন মামা বলতে পারবে, খবিস আসলে কে?'

মনটা খারাপ করে ফেললেন খালিদ সাহেব। ঘুরে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে খুলে দিলেন দরজাটা। মাঝবয়সী একটা লোক বেশ ভদ্র গলায় বললেন, 'একটা ফ্ল্যাট নাকি খালি হয়েছে আপনাদের?'

'হ্যাঁ, হয়েছে।'

'ওই ফ্ল্যাটটা একটু দেখা যাবে?'

'কেন, ভাড়া নেবেন?'

'পছন্দ হলে নেব।'

ভালো করে লোকটার দিকে তাকালেন খালিদ সাহেব। তারপর খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললেন, 'সার্টিফিকেট নিয়ে এসেছেন?'

'কীসের সার্টিফিকেট!' লোকটা অবাক হয়ে বললেন।

'আপনি যে ফ্রড না, প্রতারক না, টাকা নিয়ে পালানোর লোক না—তার সার্টিফিকেট নিয়ে আসুন।' ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দিলেন খালিদ সাহেব।

সাদিদের রুমে ঢুকেই খটখট শব্দ করল তামিয়া। ঘুরে দাঁড়াল সাদিদ। তামিয়া আরো একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আপনি ইদানিং দরজাটা খুলে রাখেন। অনেকটা হাঁ করেই খুলে রাখেন। ব্যাপার কি বলুন তো!'

'ব্যাপার তেমন কিছু না।' সাদিদ ওর হাতের ছবিটা মেঝেতে রেখে দিয়ে বলল, 'আপনারা আসবেন তো, তাই।'

'আমরা আসব আপনি জানতেন!'

'আমি না জানলেও আমার মন জানত।' সাদিদ হাসতে হাসতে বলল, 'মনের চেয়ে সবজান্তা আর কে আছে!'

তামিয়া সাদিদের দিকে একপলক তাকিয়ে পাশের ঘরে যেতে যেতে বলল, 'আম্মুকে মিথ্যে বলে এখানে এসেছি। বলেছি, আরো কিছু গোছানো বাদ আছে। আজকেই শেষ হয়ে যাবে।'

পাশের ঘরে চলে গেল তামিয়া। সাদিদ অর্নার দিকে ঘুরে দাঁড়াল, 'একটা অনুরোধ করব। অনুরোধটা এরকম—একটা ট্রেনে করে অনেক যাত্রীর সঙ্গে একটা ছেলে যাচ্ছে, আরেকটা মেয়েও যাচ্ছে। কিছু না, সত্যি কিছু না, স্রেফ তারা শুধু গল্প করবে।' সাদিদ একটু থেমে বলল, 'ট্রেনে না হোক, হেঁটে হেঁটে কাল কি আমরা একটু গল্প করতে পারি?'

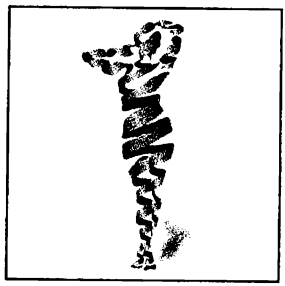

টকটকে লাল একটা টি-শার্ট পরেছেন খালিদ সুবহান সাহেব। দু হাতে দুটো কাপড়ের ব্যান্ড লাগিয়েছেন, কপালে একটা রুমালও বেঁধেছেন আষ্টেপৃষ্ঠে। থ্রি কোয়ার্টারের প্যান্ট আর নতুন কেনা উঁচু একজোড়া কেডস পরে তিনি যখন একটু পরপর হাত-পা ছুড়ে লাফাচ্ছিলেন, কিছুটা কোলা ব্যাঙের মতো লাগছিল তাকে। কোলা ব্যাঙের অবশ্য কোমড় থেকে বুক পর্যন্ত পেট, খালিদ সাহেবের গলা পর্যন্ত।।

নাতাশা মুমতাজ স্বামীর সঙ্গে কয়েক সেকেন্ড লাফিয়ে প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমার গলা দিয়ে ফুসফুস, নাড়ি-ভুঁড়ি সব বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে।' তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'এই ছাতার ব্যায়াম না করলে কী হয়!'

'অনেক কিছুই হয়।' দুটো লাফ মেরে খালিদ সাহেব বললেন, 'ব্যায়াম সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানুষের। প্রাণিজগতের মধ্যে একমাত্র মানুষই দিনের আট থেকে দশ ঘণ্টা বসে বসে কাজ করে, বাসায় সঞ্চয় করা খাবার বসে বসে খায়, নির্দিষ্ট বিছানায় হাত ছড়িয়ে ঘুমায়। অথচ একটা বাঘ তার খাবারের জন্য প্রাণপণে দৌড়ায়, একটা ভালুক বিশ মাইল পর্যন্ত হাঁটে, পাখিদের অনেকেই কয়েক হাজার বার ডানা ঝাঁপটায়।' খালিদ সাহেব নাতাশা মুমতাজের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি কি কোনো বাঘের ভুঁড়ি দেখেছ, পাখির ভুঁড়ি দেখেছ?'

'না, তা দেখিনি।' নাতাশা মুমতাজ খালিদ সাহেবের পেটের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তবে মানুষের দেখেছি।'

খালিদ সাহেব মুচকি হেসে নিজের পেটের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইনশাল্লাহ, কয়দিন পর এটা আর দেখতে পাবে না। ফ্ল্যাট টিভির মতো টান টান দেখবে এটা। ব্যায়াম শেষ, আসো, এখন আমরা হাসি পর্ব শুরু করি।' কথাটা শেষ করেই সোজা হয়ে দাঁড়ালেন খালিদ সাহেব। পুব দিকে

মাথা উঁচু করে তিনি শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে খাঁ খাঁ করে হেসে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে নাতাশা মুমতাজও। কিন্তু হাসি বন্ধ করে খালিদ সাহেব নাতাশা মুমতাজকে বললেন, 'ওরকম গলা চিকন করে হাসছো কেন! লতা মুঙ্গেশকর নাকি তুমি! হাসতে হয় খাঁ খাঁ করে। বুকের সমস্ত বাতাস বের করে। দাঁড়াও— ।' খালিদ সাহেব সোজা দাঁড়ালেন, 'আমার হাসিটা আগে দেখো, খেয়াল করো আমি কীভাবে হাসছি, তারপর তুমি চেষ্টা করো।'

সোজা হয়ে দাঁড়ালেন খালিদ সাহেব। মুখ যতটা সম্ভব প্রশস্ত করে, বুকটা টানটান করে, যেই না তিনি হাসতে যাবেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি কেশে উঠলেন। খ্যাকখ্যাক করতে তিনি যখন অস্থির হয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই সামনে এসে দাঁড়াল সামী, পাশে মনন, প্রদীপ্ত আর যুবেল। মুখটা বন্ধ করে তিনি ওদের দিকে তাকালেন। কিন্তু গলার ভেতরটা খুসখুস করছে তখনো। ব্যাপারটা টের পেল সামী। খালিদ সাহেবের একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'আংকেল, এসব ক্ষেত্রে যেটা করলে সবচেয়ে ভালো হয়, সেটা হলো—গলার ভেতর যেটা আটকে আছে সেটা গিলে ফেলা। মশার মতো ছোট্ট প্রাণী তো, সহজে যাবে না, তার জন্য পানি দিয়ে গিলে ফেলা উত্তম।' কাঁধের ব্যাগ থেকে পানির বোতলটা বের করে খালিদ সাহেবের হাতে দিয়ে সামী বলল, 'মশা জিনিসটা খুব একটা খারাপ না, সামান্য হলেও আমিষ পাওয়া যায় এটা থেকে।'

বোতল থেকে পানি খেয়ে খালিদ সাহেব বললেন, 'তোমাদের সেই কবে আসার কথা, এতদিন পর এলে!'

মনন এগিয়ে এসে বলল, 'আংকেল, আপনার এই আইডিয়াটা খুব পছন্দ হয়েছে আমাদের। গ্রেট আইডিয়া! আয়োজন করে আমরা পরচর্চা করি, অন্যের নিন্দা করি, সভা-সমাবেশের মাধ্যমে মানুষ ডেকে এনে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেই, ভোট গ্রহণের নামে মানুষের ভাগ্য নিয়ে প্রহসন করি। আরো কত কী করি! তার চেয়ে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে, সবাই মিলে হাসি চর্চা করাটা অনেক ভালো না! অনেক অনন্দদায়কও তো!' মনন সবাইকে ইশারা করল। খালিদ সাহেব আর নাতাশা মুমতাজকে নিয়ে লাইন হয়ে দাঁড়াল সামী। একটু পর প্রচণ্ড শব্দ করে হেসে উঠল সবাই একসঙ্গে।

হাসির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল, না মোবাইলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল, বুঝতে পারল না সাদিদ। ঝট করে বিছানায় উঠেই ঘড়ির দিকে তাকাল। না,

আরো আধা ঘণ্টা সময় আছে হাতে। মনে মনে ছোট্ট করে একটা ধন্যবাদ জানাল তামিয়াকে, মিসড কল দিয়ে রিমাইন্ডার দিয়েছে তাকে।

বাইরের ঘরের জানালাটা খুলে দিল সাদিদ। খালিদ সাহেবের বিল্ডিংয়ের সামনের খালি জায়গাটায় সামীরা দাঁড়িয়ে আছে, আংকেলের সঙ্গে এখনো তারা হাসছে। তারপর পরিকল্পনা মতো খালিদ আংকেলকে আরো একটু তৈলাক্ত করে সকালের নাস্তাটা সেরে ফেলবে তারা আংকেলের বাসাতেই। তুমুল আড্ডা হবে তারপর। ব্যস্ত থাকবে সবাই ভীষণ।

সাদিদ যখন মূল রাস্তায় এলো, আধা ঘণ্টা হয়ে গেছে তার পাঁচ মিনিট আগেই। কোথা থেকে হঠাৎ তামিয়া এসে দাঁড়াল সামনে, দু চোখ সরু করে একটা হাসি দিয়ে বলল, 'মানুষ তো চলতে চলতে হঠাৎ হারিয়ে যায়, যায় না?' হাসির মাত্রটা বাড়িয়ে দেয় তামিয়া, 'বাসা থেকে বের হয়ে আমার সঙ্গে বেড়াতে এসে অর্নাও হারিয়ে গেছে, আমিও হারিয়ে গেছি। তারপর কে কোথায় গিয়েছি বলতে পারব না কেউই। কিন্তু সন্ধ্যা হওয়ার আগেই আমরা আবার এখানে আসব, নিজেদের খুঁজে পাব, তারপর বাসায় ফিরব। কেমন?' মোবাইলটা বেজে ওঠে তামিয়ার। আলতো করে সেটা কেটে দিয়ে বলল, 'ও এসে গেছে, আমাকে যেতে হবে।' তামিয়া চলে যেতে নিতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে একবার অর্না, আরেকবার সাদিদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো থাকা, অন্যকে ভালো রেখে যেটা যাপন করা যায়।' তামিয়া আরো একটু হেসে বলল, 'আমি কি একটা বড়-সড় ধন্যবাদ পেতে পারি?'

পাশাপাশি দুজন হাঁটছে, মাথা নিচু দুজনেরই। পথের পাশে ফুটে থাকা বেগুনি ফুল তাকিয়ে আছে, অবিন্যাস্ত ছেয়ে যাওয়া কোনো তারে বসে মৌন প্রজাপতিও চেয়ে আছে, উঁকি দিয়ে আছে কোনো তৃষ্ণার্ত কাক, তবু ওরা হাঁটছে, চুপচাপ দুজনে হাঁটছে।

চারপাশ হঠাৎ আরো চুপ হয়ে যায় ওদের কাছে—নিস্তব্ধ, নিঝঝুম, গাঢ় থেকে গাঢ়তর। বহুদূর থেকে ভেসে আসা কী যেন একটা পাখির ডাক, ঝিরিঝিরি বাতাস, নাম না জানা ফুলের গন্ধ, আকাশের আবৃত্তি।

'তাহলে এভাবেই! পথ চলা! ছোট ছোট শ্বাস-প্রশ্বাস!''

সাদিদের দিকে অপলক চোখে তাকাল অর্না। কত কথা বলা হয়ে গেছে মনে মনে। কিন্তু মুখ ফুটে বের হচ্ছে তার এতটুকুও! এতক্ষণ ধরে ভেবেওছে অনেককিছু, বুকের ভেতর বয়ে গেছে অজানা অনেক অনুভব।

চেহারাটা হাসি হাসি করে ফেলল সাদিদ, 'তার চেয়ে বরং বাংলা সিনেমার কিছু রোমান্টিক দৃশ্যের কথা বলি।'

'না।' বেশ স্পষ্ট স্বরে বলল অর্না।

'সিনেমার পর্দায় একটা ফুল আরেকটা ফুলের সঙ্গে নুয়ে পড়ছে, স্পর্শে কাঁপছে, তার মানে নায়ক-নায়িকার মধ্যে ভালোবাসাবাসি আসন্ন।'

'সিনেমার গল্প ভালো লাগছে না।'

'আচ্ছা— ।' দু হাত পরস্পর ঘষে সাদিদ বলল, 'এটা যেন কোন ঋতু?'

'জানি না তো!' অর্না বেশ ম্লান গলায় বলল, 'ঋতু আজকাল কেউ মনে রাখে নাকি! '

'অথচ প্রকৃতি নিজে তা মনে রাখে। শরৎ এলে ঠিক ঠিক কাশফুল ফোটায়; বসন্ত এলে কোকিল তার ভাষা পায়, গান গায় গলা ছেড়ে; শীত এলেই লাল-নীল-হলুদে ছেয়ে যায় কৃষ্ণচূড়া, জারুল আর সোনালুর ডাল; বর্ষায় আকাশ নেমে আসে মাটিতে, বৃষ্টিধারায় তৈরি করে নেয় জলজ-সেতু!' সাদিদ অর্নার দিকে খুব আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে বলল, 'বৃষ্টি আর রোদ কখনো একসঙ্গে দেখেছেন?'

'দেখেছি।' ছোট্ট করে বলল অর্না।

'অথচ বিপরীত দুটি জিনিস।' সাদিদ হঠাৎ থেমে দাঁড়াল, 'চোখ পৃথিবীর সবকিছু দেখতে পায়, কিন্তু যেখানে তার বাস, সেই জায়গাটা দেখতে পায় না। কী অদ্ভুত! কিন্তু কেন, তা জানেন তো?' সাদিদ একটু হেসে বলল, 'তাহলে আত্মপ্রেমে পড়ে যেত। যারা আত্মপ্রেমে পড়ে, তারা অন্যকে তুচ্ছ করে। তারা হয় অহংকারী।'

মুগ্ধ চোখে অর্না সাদিদের দিকে তাকাল। সাদিদ সেই মুগ্ধতার জবাব দিয়ে বলল, 'মানুষ হিসেবে আমাদের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, জানেন? আমরা ভালো করে ভালোবাসতেও জানি না, ভালো করে ভালোবাসা নিতেও জানি না।' সাদিদ দু চোখ স্থির করে অর্নার দিকে তাকাল, 'আপনার কী মনে হয়?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'মনকে জিজ্ঞেস করুন না!'

বুকের ভেতর কেমন যেন করে উঠল অর্নার। লাজুক চোখে একবার সাদিদের দিকে তাকিয়ে মাথাটা নিচু করে ফেলল ও। আরো একটু কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল সাদিদ, 'আরো একটা ব্যাপার আছে মানুষের। সেটা চাইতে যেমন কঠিন, দিতেও তেমন কঠিন। সেটা হচ্ছে ক্ষমা। মানুষ ক্ষমা চাইতেও কার্পণ্য করে, ক্ষমা করতেও কার্পণ্য করে। অথচ এই একটা জিনিস পৃথিবীকে কত সুন্দর করতে পারে, আরো কত আনন্দময় করতে পারে!'

খুব শান্ত গলায় অর্না বলল, 'আপনার চোখ ভিজে উঠেছে, কেন?'

ভেজা দৃষ্টিতেই সাদিদ অর্নার দিকে তাকাল, কিছু বলল না। ঠেলে আসা দীর্ঘশ্বাসটা লুকানোর চেষ্টা করল সে, সেটাও পারল না। তারপর দূরাগত গলায় বলল, 'আপনি কি আমার বন্ধু হবেন?'

পূর্ণ চোখে অর্না সাদিদের দিকে তাকাল, 'বন্ধু হতে হলে আগে জানতে হয়। আপনি কি আমাকে জানেন?'

'জানি।' খুব আত্মবিশ্বাস নিয়ে সাদিদ কথাটা বলেই থেমে গেল। কিন্তু অনুভব করছে সে—কেউ একজন বেড়ে উঠেছে তার সত্তায়, হৃদয়ে তার স্পন্দন, রক্তে তার ঢেউ। কোনো কথা নেই তারপর, শব্দও নেই। কেবল টুকরো টুকরো শ্বাস-প্রশ্বাসের দোলা।

সাদিদ সমস্ত উচ্ছলতা ঢেলে দিয়ে বলল, 'মামনি, তুমি একটু স্থির হও। খুব স্থির। বুকের ভেতর একটা গান বাজছে আমার। শুনতে পাচ্ছো।'

কান্তা তাজিন হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি।'

'মাননি, সবার বুকে কি এই একই রকম গান বাজে?'

'হ্যাঁ। তবে একেক মুহূর্তে একেকরকম গান বাজে।' কান্তা তাজিন আবার একটু হেসে বললেন, 'নিজেকে এখন খুব নির্ভার মনে হচ্ছে, না?'

'অনেক অনেক। মামনি—।' সাদিদ একটু থেমে বলল, 'মামনি, তোমাকে আবার বলছি। সেদিন রাতে অর্না যখন একা একা বাসায় ফিরছিল, আমি কিন্তু ওকে কিছুই করিনি।'

'কিন্তু তোমার বন্ধুরা, ঠিক বন্ধুরা না, দু-একজন বন্ধু করেছিল। ওরা মেয়েটার হাত টেনে ধরেছিল, অন্ধকারে মেয়েটা চিৎকার করে উঠেছিল।

আশপাশে থেকে সবাই দৌড়ে আসে, তার আগেই তোমরা সবাই সরে আসো সেখান থেকে। তাই তো?' কান্তা তাজিন গম্ভীর গলায় বলেন।

'এই সামান্য ব্যাপারটা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল! এত ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে মানুষ বলতে লাগল!' সাদিদ দুঃখভরা গলায় বলল, 'মেয়েটা রাস্তায়ই বের হতে পারল না। শেষে পালিয়ে এসেছে এখানে, এই মফস্বলে!' সাদিদ একটু থেমে বলল, 'কিছু করিনি আমি। কিন্তু আমি তো ওখানে ছিলাম! আমার কী যে খারাপ লেগেছে! মামনি— ।' সাদিদ বেশ দ্বিধা নিয়ে বলল, 'একটা কথা বলব তোমাকে?'

কান্তা তাজিন হেসে বললেন, 'আমি জানি তুমি কী বলবে।' একটু থেমে তিনি বললেন, 'তুমি যেটাতে খুশি, আমিও, তোমার বাবুনও। তবে ছোট্ট একটা কথা— ।' কান্তা তাজিন কী একটা ভেবে বললেন, 'জীবন মানে হচ্ছে নিজেকে খুঁজে পাওয়া না, জীবন মানে নিজেকে তৈরি করা।'

খালিদ সুবহান সাহেবের বিল্ডিংয়ের সামনের খালি জায়গাটায় বসে গিটার বাজাচ্ছে সামী, আর গান গাচ্ছে প্রদীপ্ত। মনন হঠাৎ সামীর কাছ থেকে গিটারটা নিয়ে বলল, 'এবার আমি গান গাইব। কারো কোনো পছন্দ আছে?'

বাইরের ঘরের দরজা খুলে খালিদ সাহেব দ্রুত এসে বললেন, 'না, কারো কোনো পছন্দ নেই। তুমি তোমার পছন্দের গান গাও, আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনি।'

নাতাশা মুমতাজ বড় একটা ট্রে হাতে নিয়ে এসে বললেন, 'যতক্ষণ গান চলবে, ততক্ষণ চা। ফারুব আর তামিয়া কী একটা বানিয়ে আনছে, এখনই এসে পড়বে।' ট্রেটা ঘাসের ওপর রেখে পাশেই বসে পরলেন তিনি।

ফারুব এলো, তামিয়া এলো, সবশেষে অর্না এলো। খালিদ সুবহান সাহেব কিছুটা উত্তেজনা নিয়ে বললেন, 'অর্না, আয় মা, কোথায় বসবি, বোস না।'

মনন চিৎকার করে গেয়ে উঠল—

If I die young bury me in satin
lay me down on a, bed of roses
sink me in the river, at down
send me away with the words of a love song...

খুব ধীরপায়ে এগিয়ে এলো অর্না। তামিয়ার পাশে বসল সে। বিদ্যুৎ চলে গেছে অনেক আগেই। চাঁদের আবছা আলোয় সে পাশ ফিরে দেখল, ঘাসের ওপর শুয়ে আছে সাদিদ, চিৎ হয়ে, তাকিয়ে আছে সে আকাশের দিকে। আলো-আধারীর চাঁদের আলোয় কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কেবল তার চোখ দুটো চকচক করছে, গড়িয়ে পড়ার অপেক্ষায় আছে দুটি জল-বিন্দু!

অর্না হঠাৎ হাত বাড়াল, খুব নীরবে, খুব গোপনে, আনমনে। সাদিদ টের পেল তা। আড়চোখে দেখল, তার পাশে বসা জ্যোৎস্নামোড়ানো মেয়েটা কেমন অপার্থিব হয়ে উঠছে, কেমন অচেনা হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। ঘাসের ওপর পড়ে থাকা হাতটা সে সরাল না, একটু একটু অনুভূতিহীন হয়ে যাচ্ছে সেই হাতটা, একটা স্পর্শের অপেক্ষায় অল্প অল্প কাঁপছে সেই হাতটা। হঠাৎ মেঘের আড়ালে লুকাল স্বল্প আলোর চাঁদটা। তারপর কী যে হলো, স্বাক্ষী হয়ে রইল কেবল ঘাস আর ঘাসফুল, আর কেউ না!

---

pathfinder ANIK

banglapdf.net

PRESENT

ISBN 978 984 7116 61 7

9 789847 116617